মনীষী কিশোর

মনীষী কিশোর

দীননাথ সেন

গ্রন্থলোক

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

এম. টি. ৩৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মণীষী কিশোর
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৮

প্রকাশক : উৎপল হালদার
৬৪।১২ নরসিং এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪

প্রচ্ছদ : শ্রীদীননাথ সেন
অলংকরণ : শ্রীরতন আচার্য্য
ব্লক : গৌরী প্রসেস

মুদ্রাকর : সুজিত কুমার রুদ্র
নিপুন মুদ্রণ, ৩২, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

দাম : ৮ টাকা

নিবেদন

সব শিশুই বড়োদের শৈশবের কথা জানতে উৎসুক। যাঁরা উত্তরকালে বরেণ্য পুরুষ বলে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরাও যে একদিন শিশু ছিলেন, তাঁদের শৈশব কৈশোরের দিনগুলোও যে নানা কৌতূহল ঔৎসুক্যে পূর্ণ ছিল সে কথা জেনে আজকের কিশোররাও আনন্দিত রয়। হয়তো তাঁদের মতো বড়ো হবার প্রেরণাও জাগ্রত হয় অলক্ষ্যে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার 'মনীষী কিশোর' এর পরিকল্পনা। বইটি যাদের জন্যে লেখা তারা প'ড়ে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হলেই আমার শ্রম সার্থক।

গ্রন্থকার

আচার্যপল্লী
রামকৃষ্ণমিশন, নরেন্দ্রপুর
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২

সূচীপত্র

······মধু হলেন মাইকেল······

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !

—মহানিদ্রায় নিদ্রিত কবি। কবি শ্রীমধুসূদন। তাঁর অনুরোধ, বঙ্গবাসী যেন ক্ষণকালের জন্য থামে তাঁর সমাধি মন্দিরে। কেউ যেন তাঁকে না ভোলে। না, কবিকে আমরা ভুলি নি। মহাকবি তিনি। বাংলা সাহিত্যের রত্ন তিনি। মাত্র চার বছর সাহিত্য চর্চা করেছেন কিন্তু দিয়েছেন শত বছরের সম্পদ। বিচিত্র জীবন মধু কবির। জীবন নয়তো যেন একটি নাটক। সে জীবন-নাট্যের অঙ্কে অঙ্কে আছে বিস্ময়, দুঃখ, সংগ্রাম। সে নাটক দেখে আমরা কখনো আনন্দে আত্মহারা হই, বিস্ময়ে হতবাক হই আবার কখনো বা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। এই বাংলার ধুলি মলিন কোলে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি এই দুখিনী বাংলা মাকে ছাড়লেন ধনের মোহে, যশের মোহে, রূপের মোহে। চলে গেলেন দূরে, বহু-দূরে। কিন্তু তিনি সুখ পেলেন না, শান্তি পেলেন না। সেই দুখিনী বাংলা মাকে তো তিনি ভুলতে পারলেন না ! মায়ের বসন নেই, ভূষণ নেই। কিন্তু আছে স্নেহ, আছে বুকভরা ভালবাসা।

তবু ভরিল না চিত্ত, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সর্ব-তীর্থ-সার
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।

কবি আবার ফিরে এলেন। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে আশ্রয় নিলেন। একদিন এই বাংলার ধুলি গায়ে মেখে শেষ শয্যা গ্রহণ করলেন। মহানিদ্রার মধ্যে চিরশান্তির রাজ্যে পাড়ি দিলেন।

যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রাম। সাহিত্যতীর্থ সাগরদাঁড়ি। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কপোতাক্ষ নদ। কখনো সোজা কখনো বেঁকে। কখনো শান্ত কখনো উচ্ছল। কল কল শব্দে কি যেন বলে, খল খল শব্দে কখনো বা হাসে। তীরে তীরে আমের বন, জামের বন। গাছের তলায় রাখাল বালক খেলা করে। গাছের ডালে পাখিরা বাসা বাঁধে। গাছ ভরা আম, মাঠ ভরা সোনার ফসল। দূর কুঞ্জে কুবো ডাকে কুব্ কুব্। নদীর বাঁকে বক চরে খাবার আশায়। প্রকৃতির এক বিচিত্র চিত্রশালা সাগরদাঁড়ি। সত্যিই কবি কুঞ্জ। এই কুঞ্জের মহাকবি শ্রীমধুসূদন।

সাগরদাঁড়ির দত্ত বাড়ি। ধনে, মানে বড় ঘর; বিদ্যায় বুদ্ধিতে সবার ওপর। এই বংশের রামকিশোর দত্ত। তাঁর আদিবাস খুলনা জেলার তালা গ্রামে। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রেরা তালা ছেড়ে চলে এল-মামার বাড়ি, সাগরদাঁড়ি। মধুসূদনের ঠাকুরদাদা রামনিধি। চার ছেলে তাঁর—রাধামোহন, মদনমোহন, দেবীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ। রাধামোহন বড় হয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছেন। ফারসী ভাষায় বেশ দক্ষতা আছে। বড় পণ্ডিত হয়েছেন। বড় পণ্ডিত কেবল নামেই, কোন চাকরী জোটে না মোটেই। বাবার গলগ্রহ। বাবা বিরক্ত হলেন। ডাকলেন একদিন। বকলেন, 'লজ্জা করে না। এক পয়সা আয়ের মুরোদ নেই। বসে বসে কেবল বাবার অন্ন ধ্বংস করা। অকর্মার ঢেঁকি!' রাধামোহনের মনে বড় লাগল। না আর বাড়িতে থাকা নয়। একদিন সত্যি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উঠলেন যশোরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। হঠাৎ তাঁর ভাগ্য গেল খুলে। একদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা চিঠি এল। ফারসীতে লেখা। বিপদ হলো চিঠি পড়া নিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা তাঁর অফিসের কেউ

ফারসী জানেন না। ভাগ্যক্রমে সেখানে রাধামোহন উপস্থিত ছিলেন। তিনি চিঠি পড়ে মানে বলে দিলেন। সাহেব খুব খুশী। রাধামোহনের চাকরী হলো। কর্মদক্ষতায় যশোরের সেরেস্তাদার হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাইদের ভাগ্যও গেল খুলে। মেজো ভাই হলেন মুন্সেফ, সেজো ভাই যশোরের উকিল আর ছোট ভাই রাজনারায়ণ হলেন কলকাতার উকিল। চার ভায়ের আয় বড় কম নয়। সাগরদাঁড়ির দত্ত বাড়ি ধনে মানে বড় হয়, লোকে মান্য গণ্য করে। কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয়।

ওকালতির জন্য রাজনারায়ণ কলকাতা এলেন। খিদিরপুরে দোতলা বাড়ি কিনলেন। তিনি গুণী ব্যক্তি। গান, বাজনা, শিল্প-চর্চা তাঁর খুব ভাল লাগে। তন্ময় হয়ে শোনেন আগমনী গান। বিজয়া গানের করুণ সুরে ভারি হয়ে ওঠে তাঁর মন। খুল্না জেলার কাটিপাড়ায় বিখ্যাত জমিদার গৌরীচরণ ঘোষ। তাঁর মেয়ে জাহ্নবী দেবী; রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলো রাজনারায়ণের।

১৮২৪ এর ২৫শে জানুয়ারীর পুণ্য লগ্ন। এই লগ্নে পুণ্যবতী জাহ্নবীর কোলে এলেন বাংলার ভাবি মহাকবি শ্রীমধুসূদন। প্রসন্ন-কুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে রাজনারায়ণের আরো দুই পুত্র ছিল। কিন্তু অল্প বয়সেই তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মধুসূদন এক মাত্র সন্তান। আদর যত্নের তাই অন্ত নেই। যা চায় তাই পায়। যা ইচ্ছে তাই করে। যেমন ইচ্ছে তেমন চলে। সে কারো কথা শোনে না, তার কথা সকলকে শুনতে হয়। ছোট্ট মধুর জীবন শুরু স্বেচ্ছাচার দিয়ে, অসংযম দিয়ে।

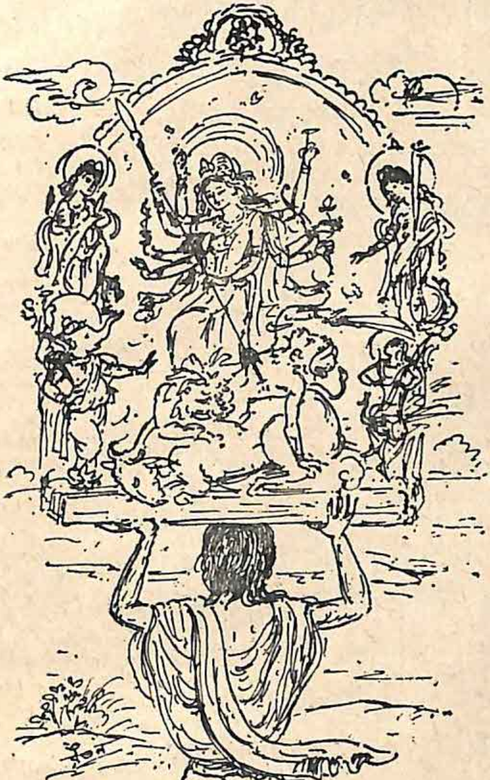
বাবা রাজনারায়ণ থাকেন কলকাতা। মা জাহ্নবী মধুকে নিয়ে দেশের বাড়িতে থাকেন। ছেলের লেখাপড়ার দায়িত্ব মায়ের ওপর।

মা তাঁর কর্তব্য করতে ভোলেন নি। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে শুভ দিনে মধুর হাতে খড়ি হয়। শুরু হয় বিদ্যাশিক্ষা। গ্রামের পাঠশালায় যথাসময়ে ভর্তি হয় মধু। শেখে বাংলা, গণিত। পাশেই সেখ্‌পাড়া গ্রামের মৌলবীর কাছে শেখে ফারসী। পাঠশালার সেরা ছাত্র মধু। গুরুমশায়ের ওপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা, ভক্তি। পড়াশুনায় তার খুব আগ্রহ। নিয়মিত পাঠশালায় যায়। সকলের আগেই তার স্কুলে যাওয়া চাই। সবার আগে যাওয়া তার নেশা হয়ে গেল। কেউ তার আগে যাবে এ তার সহ্য হয় না। তাই কোন কোন দিন আধ পেটা খেয়ে স্কুলে যায়। কখনো বা আধ সেদ্ধ তরকারী ভাত কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে দিয়ে ছুট্। ক্লাসে তার প্রথম হওয়া চাই। সকলের আগে আগেই তাকে চলতে হবে— এই তার প্রতিজ্ঞা। জীবনে বড় হওয়ার উচ্চ আশা তার ছোট বেলা থেকেই। কোন বিষয়ে কেউ তাকে ছাড়িয়ে যাবে— এ তার অসহ্য।

মধুর শিক্ষা কেবল পাঠশালাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বাড়িতে মায়ের কাছে সে শেখে অনেক কিছু। মা তাকে পড়ে শোনান রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। মধুর মন চলে যায় রামায়ণ, মহাভারতের যুগে। মনে মনে রচনা করে কল্পলোক। অসাধারণ স্মৃতি শক্তি তার। কণ্ঠ তার সুমধুর। মায়ের কাছে শোনা মহাকাব্যের অনেক অংশ সে তার সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করে। মাকে শোনায়, মেয়েদের শোনায়। জমিদার বাড়ি। বার মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। দুর্গাপূজার সময় পূজামণ্ডপে আগমনী ও বিজয়া গানের আসর বসে। বালক মধু এক পাশে বসে মন দিয়ে শোনে। আশ্বিনে আগমনী গানে, পুলক জাগে মধুর প্রাণে। ঢাক্ ডুমাডুম বাদ্যি বাজে। আনন্দ তার ধরে না যে। মধু সাজে নতুন

সাজে। বিজয়া গানের করুণ সুরে, মধুর প্রাণ ব্যথায় ভরে। চোখে আসে জল ভরে।

মা দুর্গা যাবেন চলে, বিজয়া হবে নদীর জলে।
এমনি দিনে মধুর মন, উদাস হয় ক্ষণে ক্ষণে।



মা দুর্গা যাবেন চলে, বিজয়া হবে নদীর জলে।

১৮৩৭ সাল। মধুর বয়স তখন তের। গ্রামের পড়া শেষ। রাজনারায়ণ মধুকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। গ্রামের ছেলে মধু

চলল কলকাতায় লেখা পড়া শেখার জন্য। কলকাতা এসে মধু প্রথমে খিদিরপুরের একটি ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করে। কিছুদিন পরে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়। হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান। হিন্দু কলেজ কিন্তু আধুনিক কলেজের মত ছিল না। বিদ্যালয়ী শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীকে বলা হত প্রথম শ্রেণী। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কলেজের উচ্চতর বিভাগ আর ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শ্রেণী পর্যন্ত নিম্নতর বিভাগ। প্রতি শ্রেণীতে যে এক বছর করে পড়তে হবেই এমন কোন নিয়ম ছিল না। কৃতি ছাত্র এক বছরেই দু' তিনটি ক্লাশ পার হতে পারত। মধুসূদন কলেজের নিম্নতর বিভাগে ভর্তি হল। অপূর্ব মেধা তার। কলেজের সেরা ছাত্র। মধু পুরো এক বছর কোন ক্লাশে পড়ে নি। এক এক বছরেই দু' তিনটি ক্লাশের গণ্ডী পার হয়েছে।

হিন্দু কলেজে ইংরাজি ছিল শিক্ষার প্রধান বাহন ও বিষয়। মধুসূদন অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করেন। বন্ধুদের চিঠি লেখেন ইংরেজিতে; কবিতা লেখেন ইংরেজিতে। অধ্যাপক ডি, এল, রিচার্ডসন ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক। তাঁর শেক্স্পীয়র পড়ানোর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মধুসূদন রিচার্ডসন সাহেবের ভক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রিয় অধ্যাপকের সব কিছুই নকল করতে শুরু করেন। এমন কি অধ্যাপকের খারাপ হাতের লেখা পর্যন্ত তিনি নকল করতেন। রিচার্ডসন সাহেবও মধুকে খুব স্নেহ করেন। কবিতা লেখায় উৎসাহ দেন। ইংরেজী কাগজে ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেন। ক্রমে ক্রমে মধু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মন প্রাণ ঢেলে দিলেন। শেক্স্পীয়র, বায়রণ, মুরের রচনায় ডুবে থাকেন। নানা কাগজে তাঁর কবিতা ছাপা হয়। বন্ধু মহলে তিনি Poet নামে পরিচিত হলেন।

আলেকজাণ্ডার পোপ বিখ্যাত ইংরেজ কবি। বন্ধুরা মাঝে মাঝে মধুকে 'পোপ' বলে ডাকে। মধু খুব খুশী হন।

হিন্দু কলেজে গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কৃতি ছাত্রেরা মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু মধু তাঁদের মধ্যে 'বৃহস্পতির' মত। পরীক্ষায় প্রতিবার কৃতিত্ব দেখান। বৃত্তি পান। একবার 'স্ত্রী-শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। সোনার পদক পেলেন। সাহিত্য মধুসূদনের খুব ভাল লাগলেও গণিত শাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল ; কিন্তু গণিত কোন দিন তিনি ভালবাসেন না।

একবার কলেজে বন্ধুদের মধ্যে একটা ঘোরতর তর্ক বাঁধে। শেক্‌স্‌পীয়র বড় না নিউটন বড়। মধুর মতে শেক্‌স্‌পীয়র বড়। কিন্তু ভূদেবের মত নিউটন বড়। মধুসূদন বললেন, 'শেক্‌স্‌পীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে কখনই শেক্‌স্‌পীয়র হ'তে পারতেন না।' তিনি কাজেও তা প্রমাণ করলেন। একদিন অধ্যাপক রীজ সাহেব অঙ্কের ক্লাশ নিচ্ছেন। তিনি একটি কঠিন অঙ্ক কষতে দিলেন। অঙ্কটি কেউ করতে পারল না। ক্লাশে অঙ্কের ভাল ভাল ছেলে লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে রইলেন। মধুসূদন এগিয়ে এলেন। সকলে অবাক্ হয়ে গেল। মধু করবে এই কঠিন অঙ্ক! অতি সহজ ভাবেই মধুসূদন অঙ্কটি বোর্ডে করে দিলেন। অবাক হলো বন্ধুরা, বিস্মিত হলেন রীজ সাহেব। বন্ধু ভূদেবকে বললেন, 'দেখ্‌লে তো শেক্‌স্‌পীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন? তবে গণিতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই পর্যন্ত।'

মধুসূদন কলেজের বন্ধুদের খুব ভালবাসেন। তাঁদের বিপদে, অভাবে সাহায্যের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। একবার অভাবের জন্য

ভুদেবকে কলেজ ছাড়তে হবে শুনলেন, মনে বড় আঘাত পেলেন। ভুদেব তাঁর প্রিয় বন্ধু। তিনি সাহায্যের হাত বাড়ালেন। বললেন, 'ভাই তোমার মা আমার মা ভিন্ন নন। আমার মা খরচের জন্য এত টাকা দেন, আর আমার আর এক মায়ের ছেলে তুমি টাকার অভাবে কলেজ ছাড়বে? তা কখনো হয় না।'

হিন্দু কলেজের পরিবেশে ছিল অমৃত, বহুবিধ সদ্‌গুণ। মধু সেই অমৃত পান করেন। অনেক মহৎ গুণ তিনি অর্জন করেন। কিন্তু কলেজের পরিবেশে বিষও ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠভূমি এই কলেজ। নব্য বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজ পশ্চিমের সভ্যতার চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় নিজেদের হারিয়ে ফেলল। দেশের সব কিছুই তাদের দৃষ্টিতে খারাপ। তারা হয়ে উঠল বাঁধা বন্ধহীন, বেপরোয়া। মধুসূদন এই বিষ পান করলেন আকণ্ঠ। ইংরেজরা যা করে তাই ভাল। তারা মদ খায়, গোমাংস খায়। অতএব তাই খেতে হবে। মধুসূদনের মত শিক্ষিত তরুণরা সমাজ বিরোধী সব কাজ করতে লাগলেন। ধাপে ধাপে মধু নীচে নামতে লাগলেন। মধু পুরোপুরি সাহেব হয়ে উঠলেন। বিলাসী হয়ে উঠলেন। খিদিরপুরের বাড়ি থেকে পাল্কি চড়ে কলেজে আসেন। সঙ্গে দুটি চাকর। দিনে চার পাঁচ বার পোষাক বদল করেন। চুল-ছাঁটা মনোমত হলে নাপিতকে পুরস্কৃত করেন। বাড়ির দাস দাসীদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার দেন। তখন থেকেই মনে মনে ইচ্ছা ইংল্যাণ্ড যেতে হবে। বড় কবি হতে হবে। বিলাত তাঁর স্বপ্ন, তাঁর ধ্যান হয়ে উঠল। মধুর বড় আশা, উচ্চ আশা। সেই উচ্চ আকাঙ্খার জন্য তিনি একটা ভুল করে বসলেন। এ ভুলের মাশুল তাঁকে সারা জীবন দিতে হল। তিনি হঠাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন।

১৮৪৩ সাল, ফেব্রুয়ারী মাস। মধুসূদন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। যথারীতি মধুসূদন কলেজে গেছেন। কিন্তু কলেজ থেকে আর বাড়ি ফিরলেন না। কোথায় গেলেন কেউ জানে না। বন্ধুরা চিন্তায় পড়লেন। মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বাবা চারদিকে খোঁজ করতে লাগলেন। দু দিন পর শুনলেন মধু ধর্মত্যাগ করবেন, খ্রীষ্টান হবেন।

কদিন আগে থেকেই মধু পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যাতায়াত করেন। খ্রীষ্টান হবেন জানালেন। ইংরেজ পাদ্রীরা তো শুনে খুব খুশী। মধুর মত কৃতি তরুণকে খ্রীষ্টান করতে পারলে তাঁদের অনেক লাভ। তাঁরা মধুকে গোপনে বাড়ি ছাড়তে বললেন। তাঁদের কথামত মধু ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় নিলেন। দুর্গের কর্তা ব্রিগেডিয়ার পৌনি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। এ সংবাদ পেয়ে বাবা রাজনারায়ণ মধুকে পাদ্রীদের হাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। তিনি কলকাতার প্রতিপত্তিশালী লোক। অনেক লেঠেল জোগাড় করলেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। মধুর চারদিকে সতর্ক প্রহরী, আছে পাদ্রী, আছে সৈন্য। বন্ধু গৌরদাস, ভুদেব মধুকে অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু মধু ফিরলেন না।

১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী স্মরণীয় দিন। এদিন মধুসূদন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করবেন। শীতের সকাল। মিশন রো-র 'ওল্ড-মিশন-চার্চ'—সুসজ্জিত। কলকাতা মহানগরী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চারদিকে উত্তেজনা। যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় তার জন্য খুব সতর্কতা। চার্চের সামনে সৈন্য মোতায়েন। দুর্গ থেকে যথা-সময়ে মধুসূদন এলেন। সঙ্গে সাহেব প্রহরী। নিমন্ত্রিত অথিতিরা এলেন। গীর্জার দরজা বন্ধ করা হল। সমবেত নরনারী প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেন। গানটি মধুসূদনের লেখা। ধর্মান্তর উপলক্ষে

মধুসূদন আগেই গানটি লিখেছিলেন। আর্চডিকন ডলট্রি মন্ত্রপাঠ করলেন ; পবিত্র জর্ডান নদীর জল মধুসূদনের মাথায় দিলেন। নাম দিলেন 'মাইকেল'। মধুসূদন খ্রীষ্টান হলেন। মধুসূদন হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার পিছনে তিনটি কারণ। বাবা মা এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে মধুর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এ বিয়েতে মধুর মোটেই ইচ্ছা নেই। বিয়ের জন্য মা বাবা যত তাড়া দেন মধুসূদন ততই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় বলে মনে করলেন। বিলেত গমনের প্রবল ইচ্ছা আর একটি কারণ। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে বিলেত যাওয়ার সুবিধে।

মা জাহ্নবী দেবী প্রাণাধিক পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই রাজী হলেন না। বাবাও অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

হিন্দু কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় মধু খ্রীষ্টান হন। খ্রীষ্টান মধুসূদনের জায়গা হিন্দু কলেজে হলো না। মধুসূদন ভর্তি হলেন শিবপুরের বিশপ্‌স্ কলেজে। পুত্র বিধর্মী। কিন্তু বাবা মা তাঁকে ত্যাগ করলেন না। স্নেহশীল বাবা মধুর পড়ার খরচ আগের মতই দিতে লাগলেন। বিশপ্‌স্ কলেজে মন দিয়ে পড়েন মধু। তিনি বহু ভাষা জানতেন। মোট তেরটি ভাষা শিখেছিলেন। ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালীয়, হিব্রু, বাংলা, তামিল, তেলেগু ও হিন্দী। এ ধরণের বহু ভাষা জানা লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বহু ভাষা শেখার অনুপ্রেরণা তিনি এই কলেজ থেকে পান। এই কলেজে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত শেখেন। বিশপ্‌স্ কলেজে এসে কিন্তু

শান্ত ছিলেন না। কলেজ কর্তৃপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙালী খ্রীষ্টান ছেলেরা ইংরেজ ছেলেদের মত 'কলেজ ক্যাপ' পরতে পারবে না। মধুসূদন ইংরেজ ছেলেদের মত পোষাক ও ক্যাপ পরে কলেজে আসেন। অধ্যক্ষ নিষেধ করলেন। মধুসূদন বললেন, 'তবে আমাকে দেশীয় পোষাক পরে আসতে দিন, নইলে ইংরেজদের পোষাকে আসতে দিতে হবে।' অগত্যা কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবী মেনে নিলেন।

মধুসূদন বিশপ্স্ কলেজে চার বছর পড়েন। এবার বাবার সঙ্গে কিন্তু তাঁর বিরোধ বাধল। বাবা, এখন মধুকে আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, নানা পরামর্শ দিতে লাগলেন। মধুসূদনের কিন্তু একেবারেই পছন্দ হলো না বাবার এ কাজ। বাবা ছেলের মধ্যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। শেষ ঝগড়া বিবাদ। বাবা বিরক্ত হয়ে সাহায্য বন্ধ করলেন। মধুসূদন বিপদে পড়লেন। জমিদারের ছেলে; দুঃখ কি জানেন না। অর্থের অভাব জানেন না। দুঃখী মানুষের দুঃসহ ব্যথা কি জানেন না। এতদিন যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। চোখে অন্ধকার দেখলেন। এ অপমান, তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ঠিক করলেন বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। সামনে ঘোর অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মধুসূদন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে অন্ধকারের গর্ভে ঝাঁপ দিলেন। হঠাৎ একদিন বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন মাদ্রাজে—মা, বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে। অভিমানী মধু মা জাহ্নবী দেবীকে কাঁদিয়ে, চলে গেলেন দূরে, বহুদূরে।

……কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম……

—"করলি কি বাবা! গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি?"

—"মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়?"

কে এই মাতৃভক্ত ছেলে? পবিত্র গঙ্গা মায়ের কাছে তুচ্ছ। দেবতার চেয়ে মা বড়। কে ইনি? একজন সম্রাট ইনি। সম্রাট, কিন্তু রাজত্ব নেই, সৈন্য নেই, নেই মুকুট। কে এই মুকুটহীন সম্রাট? বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাংলায় তখন নবাবী আমল। বাংলার পথে পথে কৃষ্ণ নাম গেয়ে বেড়ান এক বৈষ্ণব সাধক। বলরাম ব্রহ্মচারী তাঁর নাম। সঙ্গে রাধাবল্লভ বিগ্রহ। জাগ্রত দেবতা। ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মচারী একদিন উপস্থিত কাঁটালপাড়া গ্রামে। নবাব আলিবর্দীর আদেশে দেবসেবার জন্য কৃষ্ণনগরের মহারাজ ব্রহ্মচারীকে কিছু জমি দিলেন। কাঁটালপাড়ার রঘুদেব ঘোষাল তাঁর প্রধান শিষ্য। মৃত্যুর আগে ব্রহ্মচারী দেব সেবার ভার রঘুদেবকে দিয়ে গেলেন। রঘুদেব মন্দির করলেন, নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ধনী। একমাত্র মেয়ে। কোন ছেলে নেই। মেয়ের বিয়ে দিলেন হুগলীর দেশমুখো গ্রামের চাটুয্যে বংশের রামজীবনের সঙ্গে। একমাত্র মেয়ে; তাই রামজীবনকে ঘর-জামাই হয়ে থাকতে হলো কাঁটাল-পাড়ায়। রামজীবনের একটি মাত্র ছেলে, রামকুমার। রঘুদেব সমস্ত সম্পত্তি দিয়েগেলেন নাতিকে। দিয়েগেলেন রাধাবল্লভজীকে।

যাদবচন্দ্র এই বংশেরই যোগ্য সন্তান। জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়,

বুদ্ধিতে আদর্শ পুরুষ তিনি। চাটুয্যে বংশে সর্ব প্রথম সরকারী চাকরী নিলেন যাদবচন্দ্র ও তাঁর দাদা কাশীনাথ। সামান্য চাকরীতে ঢুকে নিজের দক্ষতায় তিনি ডেপুটি কালেক্টর হন। রায়বাহাদুর খেতাব পান।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮, ২৬শে জুন) রাত ন'টা। চাটুয্যে বাড়ীতে শাঁখ বেজে উঠল। সেজবাবু যাদবচন্দ্রের একটি ছেলে হয়েছে। চাঁদের মত ফুটফুটে ছেলে। তখন কে জানত শুভক্ষণে জন্ম নিল এক আশ্চর্য শিশু। শিশুটি কিন্তু খুব পয়মন্ত। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চাটুয্যে বংশের সৌভাগ্যের সূচনা। ঐ বছরই যাদবচন্দ্রের চাকুরীতে উন্নতি হলো। তিনি ডেপুটি কালেক্টর হলেন। বাড়িতে আনন্দের সীমা নেই। খুব ধুম ধামের সঙ্গে অন্নপ্রাশন হলো। শিশুর নাম রাখা হলো বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমের বয়স তখন পাঁচ। তার হাতে-খড়ি হবে। কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য গঙ্গাজল দিয়ে মেঝে ধুলেন। খড়ি দিয়ে লিখলেন, অ, আ বর্ণ দুটি। শিশুকে ভাল করে দেখতে বললেন অক্ষর দুটি। মুছে দিলেন। বললনে, 'লেখ, ঠিক আমি যেমন লিখেছি।' সকলের চোখ শিশুর দিকে। খড়ি দিয়ে শিশু সহজ ভাবেই অক্ষর দুটি সুন্দর করে লিখল। অবাক হয়ে দেখল সকলে। মা সরস্বতী কি আড়াল থেকে তাকে সাহায্য করলেন ? বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ নাতির কৃতিত্ব দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'কালে এই বালক বংশের ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে।' মহাপণ্ডিতের এই ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয় নি।

বালক বঙ্কিম কোনদিন পাঠশালায় পড়ে নি। হাতে খড়ির পর যাদবচন্দ্র পাঠশালার গুরুমহাশয় রামপ্রাণ সরকারকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি সকাল সন্ধ্যায় এসে বঙ্কিমকে পড়িয়ে যান।

—বলো স্বরে অ, স্বরে আ।

—অ, আ।

—না, বলো স্বরে অ, স্বরে আ॥

—কেন, মাষ্টার মশাই, শুধু অ, আ বললে হয় না?

প্রথম দিনেই গুরুমশায়ের কাছে এই ভাবে শুরু হলো তার লেখাপড়া। অদ্ভুত মেধা বঙ্কিমের। মাত্র একদিনেই বর্ণমালা শেখা শেষ। অতি অল্প দিনেই 'শিশুবোধক'ও শেষ।

ছোটবেলা থেকেই বঙ্কিমের লেখাপড়ায় খুব ব্যাঘাত হয়। চাকরীর জন্যে বাবা থাকেন বাইরে; দাদা শ্যামাচরণও থাকেন বাইরে। বাড়িতে অবিভাবক বলে কেউ ছিলেন না। বঙ্কিমের অবাধ স্বাধীনতা, ফলে লেখাপড়া ছাড়া আর সব হলো। ছোট বেলা থেকেই তাসের খুব ভক্ত হয়ে উঠল। তাছাড়া একবার বাবার কাছ থেকে লেখাপড়া করা, একবার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করা—ফলে লেখাপড়ায় গুরুতর বিঘ্ন।

মাঝে মাঝে বঙ্কিম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়ে হাজির হয়। গুরুমশায়ের বেত নিয়ে ছেলেদের পড়াশুনার তদারক করে। বন্ধুদের শাসায়, কেন তারা সেদিন তাস খেলতে যায় নি।

তখনকার সময় পশ্চিমভারত থেকে গোরা সৈন্য মাঝে মাঝে কলকাতায় আসত। অসুস্থ সৈন্যরা নৌকো করে আসত। মাঝে মাঝে গ্রামে উঠে তারা অত্যাচার করত। দু-তিন বছর আগে তারা একবার খুব অত্যাচার করে। সেই থেকে গোরার বহর শুনলে গ্রামের লোকে ভয় পায়। একদিন শীতের সকাল। বঙ্কিম গুরুমশায়ের বেত নিয়ে ছেলেদের পড়াশুনা দেখছে। এমন সময় শোনা গেল হৈ চৈ। গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লেগেছে। এ সংবাদ শুনে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। পাততাড়ি ফেলে পাঠশালার

ছেলেরা পালাল, চটি জুতো ফট্ ফট্ করতে করতে গুরুমশায় পালালেন। বেগুনের ঝুড়ি ফেলে বাজারের লোক পালাল। মুহূর্তে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ।

কেবল চাটুয্যে বাড়ির দরজা খোলা বঙ্কিমের জন্য। বঙ্কিম বেত হাতে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির মধ্যে ঢুকল না। গোরার বহরকে লোকে ভয় পায় কেন সে ভেবে পায় না। সে আজ দেখবে গোরা সৈন্যদের। কি সাহস এই বালকের! কিছুক্ষণ পরেই দলে দলে গোরা সৈন্য এল। বঙ্কিমের সঙ্গে কি সব কথা হলো তাদের, কেউ বা তার হাত থেকে বেত নিয়ে দেখতে লাগল। বালক বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। আধ ঘণ্টা পরে তারা চলে গেল। গ্রামে আবার প্রাণ ফিরে এল। বাঙালীর ছেলে জুজুর ভয় পায়; কিন্তু এমন দু-একজন আছে যারা জুজু দেখতে চায়। বঙ্কিম সেই দলের।

একবার সংবাদ এলো চাটুয্যে বাড়িতে ডাকাতি হবে। বাড়ির সকলে তো ভয়ে অস্থির। ঠিক হলো কয়েক রাতের জন্য বাড়ির সবাই প্রতিবেশীর বাড়িতে থাকবে। কিন্তু বঙ্কিম বেঁকে বসল। বয়স তখন দশ বছর।

তা কখনো হতে পারে না। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না।

পিসেমশায় বললেন, 'তবে ডাকাত এসে সকলকে কেটে যাক।'

'কেন কেটে যাবে? বাড়িতে অনেক লোক! তাছাড়া গ্রামের লেঠেল তেওর, বাগ্দীদের নিযুক্ত করুন; সাধ্য কি যে ডাকাত আমাদের কেটে যাবে?'

অগত্যা তার কথা মত ব্যবস্থা করা হল। ডাকাত এসে ফিরে গেল। সেই দিন থেকে সকলে বঙ্কিমকে 'বাঁকা' বলে ডাকে।

বঙ্কিমের ছ' বছর বয়সের সময় যাদবচন্দ্র মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর হন। ছেলেদের তিনি মেদিনীপুরে নিয়ে এলেন। এখানকার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে। প্রধান শিক্ষক টীড্ সাহেব বঙ্কিমকে খুব স্নেহ করেন। বঙ্কিম ইংরেজিতে খুব ভাল। টীড্ সাহেবের স্ত্রীও তাকে খুব ভাল বাসেন। তাকে বাড়িতে নিয়ে যান। ম্যাজিষ্ট্রেট মলেট্ সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। প্রায়ই তিনি নিজের ছেলেদের সঙ্গে বঙ্কিমকে নিয়ে যান মলেট্ সাহেবের বাংলোয়। মেম সাহেবদের সঙ্গে নানা গল্প করে বঙ্কিম। এরকম ভাবে দীর্ঘ তিন বছর বালক বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে। একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় চায়ের আসর বসেছে। মেম সাহেবরা ভেতরে চা তৈরীতে ব্যস্ত। বঙ্কিম তার সমবয়সী ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। এমন সময় এক অপরিচিত সাহেব কেবল ইংরেজ ছেলেদের ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে! বঙ্কিম খুব রেগে গেল। কি? এত বড় অপমান! আর কোন দিন সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় যায় নি।

যাদবচন্দ্র কলকাতার আলিপুরে বদলী হলেন। বঙ্কিমচন্দ্ররাও কাঁটালপাড়ায় এলো। বয়স তখন সাড়ে এগার বছর। ১৮৪৯ সালের ২৮শে অক্টোবর ভর্তি হলেন হুগলী কলেজে। এই কলেজে স্কুল ও কলেজ দুটি ভাগ। স্কুলে আবার সিনিয়র ও জুনিয়র দুটি ভাগ। বঙ্কিম জুনিয়র বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। মাসে দু টাকা বেতন। রোজ কাঁটালপাড়া থেকে যাতায়াত করেন। নৌকা করে গঙ্গা পার হন। কার্ সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ। ব্রেন্যাণ্ড সাহেব পড়ান অঙ্ক, ভূগোল। সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ান গ্রেভস্ সাহেব। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দুজন বিখ্যাত বাঙালী অধ্যাপক। দ্বারকানাথ মিত্র ছিলেন কলেজে বঙ্কিমের প্রিয় বন্ধু। কলেজের সেরা ছাত্র এঁরা দুজন।

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চা শুরু। 'সংবাদ প্রভাকর' তখন বিখ্যাত পত্রিকা। সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। অনেক বিখ্যাত লেখকের হাতে খড়ি হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই পত্রিকায় সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার কবিতা প্রতিযোগিতায় বঙ্কিম কুড়ি টাকা পুরস্কার পান। এই পত্রিকার মাধ্যমে 'কবিতার যুদ্ধ' হতো। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র কবিতা লিখতেন, তার উত্তরে হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা লিখতেন, কেউ কাউকে চেনেন না। এই কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দীনবন্ধুর সঙ্গে পরিচয়। একদিন ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমকে বললেন, 'তোমার লিখবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখে গদ্য লিখবে।' বঙ্কিম সাহিত্যগুরুর উপদেশ মেনে নেন। ষোল বছরের পর তিনি আর কবিতা লেখেন নি।

হুগলী কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম সংস্কৃতও শিখতে লাগলেন। কাঁটালপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ। তাঁর টোলে প্রতিদিন যান বঙ্কিম। চার বছর ধরে পড়লেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য। ভারতচন্দ্র, জয়দেব তাঁর প্রিয় কবি। শোনেন মহাভারতের কাহিনী, নলোপাখ্যান, শ্রীবৎসরাজার গল্প।

একবার খুব কুয়াসা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলী কলেজে পড়েন। ঘন কুয়াসায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বঙ্কিম সঙ্গীদের সঙ্গে কলেজে চলেছেন। মাঝি নৌকা ছাড়তে রাজি নয়। বঙ্কিম নাছোড়বান্দা। অগত্যা মাঝি নৌকা ছাড়ল। দশ পনের মিনিটে

গঙ্গা পার হওয়া যায়। কিন্তু নৌকা চলছে তো চলছেই। প্রায় ঘন্টা খানেক হয়ে গেল।

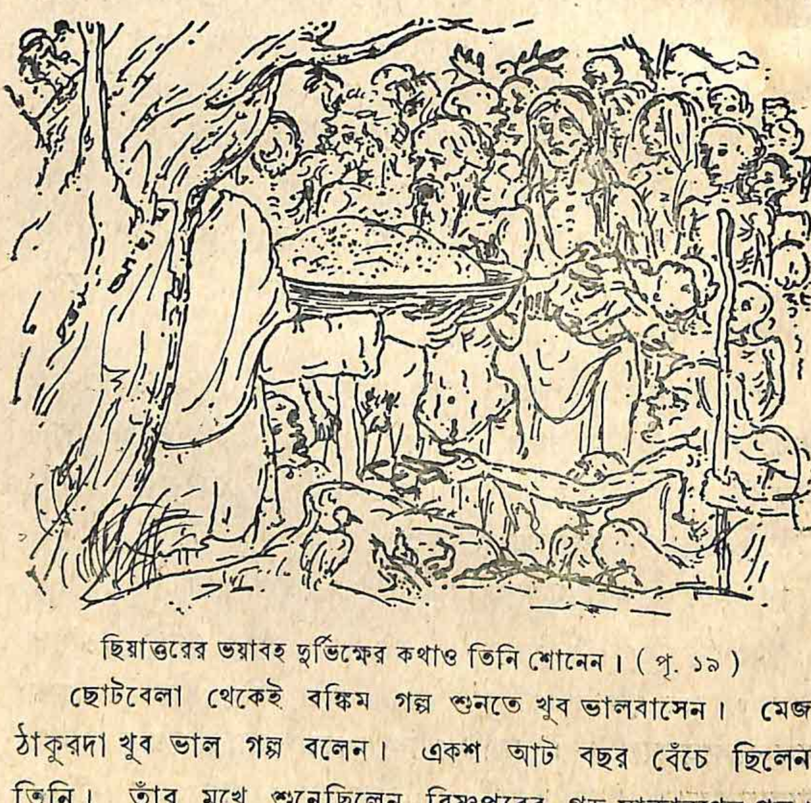
বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'আজ্ঞে তা জানি নে, বাবু।'

'সে কি রে?'

'আজ্ঞে বোধ হয় ভাঁটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।'

মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে। বহুক্ষণ পরে নৌকা মুলাজোড়ে এসে ভিড়ল। তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সেই ভীষণ কুয়াসা বর্ণনা মনে হয় এই অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা।



ছিয়াত্তরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথাও তিনি শোনেন। (পৃ. ১৯)

ছোটবেলা থেকেই বঙ্কিম গল্প শুনতে খুব ভালবাসেন। মেজ ঠাকুরদা খুব ভাল গল্প বলেন। একশ আট বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর মুখে শুনেছিলেন বিষ্ণুপুরের গড় মান্দারণের গল্প।

উড়িষ্যা থেকে পাঠানরা এসে গড় মান্দারণের জমিদারের সব কিছু লুট পাট করে নিয়ে যায়। জমিদারের স্ত্রী, কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এই গল্প নিয়ে পরে বঙ্কিম তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখেন। ছিয়াত্তরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথাও তিনি মেজ ঠাকুরদারমুখে শোনেন। খুব জীবন্ত সে কাহিনী। বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের বীজ এই কাহিনী।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি মাসিক আট টাকা বৃত্তি পেলেন। ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও প্রথম হলেন। মাসে কুড়ি টাকা করে বৃত্তি পেলেন। কলেজ বিভাগে দু বছর পড়ে থার্ড্ ইয়ারে উঠলেন। এ সময় তিনি হুগলী কলেজ ছাড়েন! এবার প্রেসিডেন্সি কলেজ। হিন্দু কলেজ তখন সবে মাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়েছে। বাবার খুব ইচ্ছা বঙ্কিম হাকিম হোক। বিশেষ করে কালেক্টার সেভিল সাহেব যাদবচন্দ্রকে বলেছেন, বাঁকা যেন আইন পড়ে। আইন পাশ করলেই ডেপুটির চাকরী বাঁধা। ১৮৫৬ সালের ১২ই জুলাই বঙ্কিম প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন ক্লাশে ভর্তি হলেন

বাঁকার জন্যে কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া করা হল, সঙ্গে যাবে বাণেশ্বর ঠাকুর আর চাকর মুরলী। মাঝে মাঝে মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র কলকাতা যেয়ে বাঁকাকে দেখে আসবেন। শুভদিনে বঙ্কিমচন্দ্র বাবা, মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে, গৃহদেবতা রাধাবল্লভের আশীর্বাদ নিয়ে কলকাতা রওনা হলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন বঙ্কিম। প্রিন্সিপ্যাল সাটক্লিপ সাহেব। অক্ষয় সরকার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, আইন ক্লাশে বঙ্কিমের সহপাঠি। বাংলা মায়ের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন এঁরা।

১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। বঙ্কিম ঠিক করলেন বি. এ. পরীক্ষা দেবেন। সময় খুব কম। মাত্র দু মাস বাকি। মেজদার ইচ্ছে ছিল না বঙ্কিম এখন পরীক্ষা দিক। বঙ্কিম কিন্তু পেছলেন না। অনেকেই পিছিয়ে গেল। বঙ্কিম এ দু মাস তাস খেলা বন্ধ রাখলেন। প্রথম বি. এ. পাশ করার গৌরব লাভ করার জন্য সকলেই আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত দশ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসলেন। ফল বেরুলে দেখা গেল দুজন মাত্র পাশ করেছেন। প্রথম হয়েছেন বঙ্কিম দ্বিতীয় হয়েছেন যদুনাথ বসু। বি. এ. পাশের পর বঙ্কিম আবার আইন পড়া শুরু করেন। ১৮৫৭ সাল। ভারতের সব জায়গায় আগুন জ্বলে উঠেছে। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন। কলকাতা শহরের অবস্থা খুবই খারাপ। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সেই অশান্ত সহরে শান্ত ভাবে পড়ে চলেছেন। আইনের অধ্যাপক মন্ট্রিয়ো সাহেব একদিন ক্লাশে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বিদ্রোহে ইংরেজ যদি হেরে যায় তাহলে দেশের অবস্থা কি হবে ?' নির্ভিক বঙ্কিম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যদি একদিনের জন্যও মনে করতাম ইংরেজের রাজত্ব যাবে, তাহলে ইংরেজের এই আইন কেতাব সব গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতাম।' এক বছরের মধ্যে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করলেন।

বাংলার ছোটলাট তখন হ্যালিডে সাহেব। তাঁর নির্দেশে চীফ্ সেক্রেটারী সেরা ছাত্র প্রথম বি. এ. বঙ্কিমকে ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিসে।

বললেন, 'তুমি কি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী নিতে চাও ?'

তখনকার সময়ে বাঙালীদের সব চেয়ে বড় চাকরী এটা। সাহেব মনে করলেন বঙ্কিম কৃতার্থ হয়ে যাবেন।

বঙ্কিম বললেন, 'বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি কিছুই বলতে পারব না স্যার।'

—তুমি এর থেকে আর কি উঁচু পোষ্ট আশা কর ?

—যত বড় চাকরীই হোক বাবার সঙ্গে কথা না বলে আমি গ্রহণ করতে পারব না।

—বেশ, তবে বাবার সঙ্গে পরামর্শ কর।

বাবা যাদবচন্দ্র বঙ্কিমকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী নিতে বললেন। বয়স তখন সবে কুড়ি।

......ঈশ্বরপ্রেমী কেশব......

শ দেড়েক বছর আগের কথা। বাংলা তথা ভারতে মানুষের মুখে মুখে তখন একটি নাম—রামমোহন রায়। রামমোহনের মতন তখন বাংলার ঘরে ঘরে আর একটি নামও সকলের মুখে মুখে ফেরে—তিনি রামকমল সেন। কলকাতার কলুটোলার বিখ্যাত সেন বংশের সন্তান ইনি।

সেন-বংশের আদিবাস জাহ্নবী তীরে গৌরিভা গ্রামে। কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে এই গ্রাম। সেন-বংশের ঐতিহ্য বিরাট। বহু পুরনো এই বিখ্যাত বৈদ্য বংশ।

রামকমলের বাবা গোকুলচন্দ্র সেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি অল্প লেখাপড়া জানতেন। হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে একটি চাকরি করতেন। গোকুলচন্দ্রের মেজছেলে রামকমল।

অসাধারণ প্রতিভাবান লোক রামকমল। তাঁর মত লোক 'লাখে মেলে না এক'। গৌরিভা গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু; পরে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু টাকার অভাবে পড়া ছাড়তে হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসে মাসে আট টাকা বেতনে কম্পোজিটারের কাজে ঢুকলেন। আট বছর কাজ করার পর চার টাকা মাইনে বাড়ল। তাঁর ছিল বুদ্ধি, প্রতিভা, দক্ষতা। তিনি কর্তৃকপক্ষের সুনজরে পড়লেন। কেরানীর কাজে উন্নীত হলেন। বিখ্যাত উইলসন সাহেব তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। অবসর সময়ে রামকমল সোসাইটির বই পড়েন। তাঁর কর্মদক্ষতার ফলে তিনি সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। সব-শেষে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। মাসে মাইনে দু হাজার টাকা। ক্রমে ক্রমে রামকমল সেন অর্থে, বিদ্যায়, মান সম্ভ্রমে, খ্যাতিতে

বাংলার প্রথম সারির লোক হিসাবে পরিগণিত হলেন। সমাজ সংস্কারে, শিক্ষার উন্নতিতে তাঁর অবদান কম নয়। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর চেষ্টা, উৎসাহ স্মরণীয়। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। সরল, সহজ, পবিত্র জীবন তাঁর।

রামকমল সেনের মেজ ছেলে প্যারীমোহন সেন। প্যারীমোহন বাবার মত অত নামকরা লোক নন ঠিক, তবে তিনিও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। তাঁর অন্তর ছিল বড় কোমল ও দয়ালু! তিনি ছিলেন গরীবের বন্ধু। প্যারীমোহনের স্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবী। সারদাসুন্দরী ছিলেন ভক্তিমতী, সতী নারী। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। গৌরিভা গ্রামের এক শাক্ত পরিবারের মেয়ে তিনি। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি অত্যন্ত দীনভাবে বড়দের অধীনে দিন কাটান। নিয়মিত পূজা, আহ্নিক করেন। সংসারের যাবতীয় কাজ করেন। বিধবা নারীর কঠোর ব্রত হাসি মুখে পালন করেন। এই সতী নারী বাংলায় সকলের নমস্যা। তাঁরই সন্তান কেশব চন্দ্র।

১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বরের সকালে সেন বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। ঘোষণা করল এক মহাপুরুষের আগমন বার্তা। সারদাসুন্দরীর কোলে আবির্ভূত হলেন দেবশিশু কেশবচন্দ্র। শিশুর কি রূপ, কি রঙ! যেন সাক্ষাৎ দেবদূত!

কেশবচন্দ্র মাত্র ন বছর বয়সে বাবাকে হারান। প্যারীমোহনের বয়স তখন মাত্র চৌত্রিশ বছর। কেশবের দেখাশুনার ভার নিলেন মা সারদা দেবী আর দাদা নবীনচন্দ্র। ছোটবেলায় কেশব বড় রোগা ছিলেন, কিন্তু নিখুঁত ছিল দেহের গড়ন, যেন খোদাই করা মূর্তি।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে অনেক মহৎ গুণ দেখা যায়। খুব ধীর স্বভাব ছিল তাঁর। অল্প কথা বলেন। কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেন না। গম্ভীর স্বভাব। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন থাকেন। নিজের ডেস্ক, বাক্স সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। কাউকে হাত দিতে দেন না।

কেশবের লেখাপড়া শুরু বাড়িতে গুরুমহাশয়ের কাছে। তারপরে ভর্তি হলেন একটি পাঠশালায়। আলবার্ট হলে এই পাঠশালা বসত। পাঠশালার পাঠ শেষ করে এলেন হিন্দু কলেজে। এই কলেজের নীচের ক্লাশে ভর্তি হলেন। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনায় খুব আগ্রহ। প্রতি বছর পুরস্কার পান। বছরে একটি করে তো বটেই, কখনো বা দুটি করে পুরস্কার পান। পুরস্কারের বড় বড় বই বয়ে আনতে ছোট্ট ছেলে কেশবের কষ্ট হত। পড়াশুনায় খুব মনোযোগী, পরিশ্রমী। একদিন তিনি ছাদে বসে পড়ছেন। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ির লোক তাঁকে আর খুঁজে পায় না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। অনেক চেষ্টা ও খোঁজাখুঁজির পর কেশবকে ছাদে পাওয়া গেল।

কেবল লেখাপড়ার বিষয়ে নয় অন্যান্য অনেক গুণের সমাবেশও কেশবের মধ্যে দেখা যায় সেই ছেলেবেলা থেকেই। নির্মল হাসি ঠাট্টায় তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। অনুকরণে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। কলেজে বা টাউন হলে মাঝে মাঝে বাজী দেখান হত। তিনি তা দেখে হুবহু সেই বাজী নিজের বন্ধুদের দেখিয়ে আনন্দ দিতেন। পুরানো খবরের কাগজে ছবি এঁকে ম্যাজিক দেখাতেন। কখনো বা মোমবাতির ভেতর থেকে রুমাল বার করে, কখনো বা রঙীন জলের গ্লাস থেকে ফুল, বন্দুকের ভেতর থেকে ঘড়ি বার করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন। কখনো বা তিনি বাজীকর সাহেব সাজতেন।

বাজার থেকে সাহেবদের পুরানো পোষাক কিনে সাহেব হতেন। ইংরেজি উচ্চারণের ভঙ্গীও তাঁর নিখুঁত। একবার তাঁর বাজী দেখে তো খোদ এক ইংরেজ সাহেব পর্যন্ত অবাক। তিনি ভেবেছিলেন, বুঝি কোন ইটালী দেশীয় বাজীকর বাজী দেখাচ্ছে।



কখনো বা তিনি বাজীকর সাহেব সাজতেন।

ছোটবেলা থেকেই নেতা হওয়ার লক্ষণ কেশবের মধ্যে দেখা যায়। নিজেই নানারকম খেলার পরিকল্পনা করতেন আর নিজেই হতেন

দলনায়ক। কখনো বা কেশব ডাক্তারখানা খুলে বসতেন। নিজে ডাক্তার, বন্ধুদের মধ্যে কেউ বা রোগী, আবার কেউ বা কমপাউণ্ডার। কখনো ডাকঘর বানাতেন। নাকে নীল চশমা পরে কেশব নিজে হতেন পোষ্টমাস্টার। সঙ্গীদের কেউ কেউ হত পিয়ন। কখনো বা ইংরেজি ব্যাণ্ড তৈরী করতেন। কারো কাঁধে জয়ঢাক ঝুলিয়ে নিজেই বাজাতেন। বাড়ীর ছোকরা চাকর বাকরদের নিয়ে রামযাত্রার গান গাইতেন কখনো। কাউকে হনুমান সাজাতেন কাউকে বা রাবণ।

বাল্যকাল থেকেই ধর্মে কেশবের খুব অনুরাগ। ন-দশ বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মভাব দেখা যায়। বন্ধুদের সঙ্গে কার্তিক পূজায় ও রথযাত্রায় যোগ দিতেন। বৈষ্ণববাড়ির ছেলে; তাই তিলক কাটেন, চন্দন পরেন; মৃদঙ্গের তালে তালে নেচে নেচে হরিনাম করেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মাছ খাওয়া ছাড়েন। মাংস তো আগে থেকেই বন্ধ বৈষ্ণব পরিবারে। অনেক দুষ্ট ছেলে ধর্মের বেশ পরে তাঁর বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু কেশব তাদের ঠিকই চিনতে পারতেন। তিনি তাদের সঙ্গে মিশতেন না; গলাগলি ভাব কারো সঙ্গেই ছিল না। আপনাতে আপনিই থাকতেন। এজন্যে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝত। তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান, তেমনি বিনয়ী ও লজ্জাশীল। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। সমবয়সী বন্ধুরা তাঁকে ভয় করত, সম্ভ্রম করত, আবার বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান বলে সমীহ করত।

হিন্দু কলেজে কেশবের পড়াশুনা বেশ ভালভাবেই চলছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর পড়ায় প্রবল বাধা পড়ল। অভিভাবকেরা তাঁকে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি করে দিলেন। এই কলেজটি অল্পদিন মাত্র স্থাপিত হয়েছে। চলেও নি বেশি দিন। পড়াশুনা একেবারেই ভাল হত না। কলেজ কর্তৃপক্ষ সস্তায় নাম কেনার জন্য নিচের শ্রেণীর

ছাত্রদের উঁচু শ্রেণীতে ভর্তি করতেন। কেশবকেও তাই করা হল। ফলে তিন বছরের পড়া তাঁকে অল্প সময়ে পড়তে হল। প্রতিভাবান কেশবের তাতে অসুবিধা হয় নি ; তবে অঙ্কে ভীষণ অসুবিধা হল। যাই হোক অর্থের অভাবে 'মেট্রোপলিটন কলেজ' বন্ধ হয়ে গেল। কেশবচন্দ্র আবার হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। এ কলেজে থাকলে এতদিনে কেশবচন্দ্র কলেজী শিক্ষা শেষ করতে পারতেন ; কিন্তু তা হলো না। যাই হোক মনোযোগ দিয়ে কেশব আবার পড়া শুরু করলেন। সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস ভালভাবেই পড়লেন ; কিন্তু অঙ্ক একেবারেই ভাল লাগল না। কলেজে একটা বিশেষ ঘটনার জন্যে কেশব লেখাপড়া একেবারে ছেড়ে দিলেন। একবার পরীক্ষার সময় কেশবচন্দ্র নাকি পাশের ছেলের খাতার সঙ্গে তাঁর খাতা মেলাচ্ছিলেন, শিক্ষক তা দেখতে পেয়ে কেশবকে বকেন আর পরের পরীক্ষাগুলো না দিতে দেওয়ার ভয় দেখান। কেশবচন্দ্র এই ঘটনায় খুবই ব্যাথা পান। তিনি কলেজে আরো দুবছর পড়েন বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্যে।

বড় ঘরের ছেলে কেশব ; কিন্তু বিলাসী নন, উচ্ছৃঙ্খল নন। আচারে ব্যবহারে খুব সংযমী। অত্যন্ত মিতাচারী তিনি। মাত্র আঠার বছর বয়সে কেশবচন্দ্রের বিয়ে হল ন বছরের মেয়ের সঙ্গে। বালী গ্রামের চন্দ্রনাথ মজুমদারের মেয়ে। বিয়েতে খুব ধুমধাম হয়, বাদ্য-বাজনা হয়, নাচ-গান হয়। কেশবের এর কোনটাই ভাল লাগে নি। তিনি তখন অভিভাবকদের অধীন। আজীবন তিনি বাল্য-বিবাহ, স্থুল আমোদ-প্রমোদের বিরোধিতা করেছেন। বিয়ের এক বছর পরেই কেশবচন্দ্রের মনে প্রবল বৈরাগ্যের ভাব এল। বালিকা স্ত্রী মনে খুব দুঃখ পেলেন। আত্মীয়স্বজনেরা প্রমাদ গনলেন। কিন্তু কেশব কোন কিছুতেই ভুললেন না। তাঁকে যে অনেক কাজ করতে

হবে। তাঁকে যে লোক-শিক্ষা দিতে হবে। ঘরে থেকে বৈরাগ্যের শিক্ষা দিতে হবে। তিনি একা একা থাকেন, নির্জনে থাকেন, বন্ধুদের সঙ্গ ভাল লাগে না ; এমন কি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। সব সময় কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন, আর ধর্মগ্রন্থ পাঠে ব্যস্ত থাকেন। কেশবচন্দ্র ধীরে ধীরে ধর্মজীবনে প্রবেশ করছেন।

নীতি শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কয়েকটি ব্যবস্থা করেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হত। নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নিজের বাড়িতেই একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, আর স্থাপন করেন 'গুড্ উইল্ ফ্রেটারনিটি' সভা। এই সভায় কেশব বক্তৃতা করেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এই সভায় একদিন হঠাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন।

কেশবচন্দ্র বাইবেলের বড় ভক্ত ছিলেন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পাদরী-দের কাছে তিনি বাইবেল পড়েন। অভিভাবকরা প্রমাদ গনলেন, বুঝি কেশব খ্রীষ্টান হয়ে যান। ক্রমে ক্রমে কেশবের মনে সত্যধর্মের উদয় হয়। কেশবচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সন্তান ; কিন্তু কোটি কোটি দেবদেবীতে তাঁর বিশ্বাস নেই। এক ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেন। এই সময় পরিবারের নিয়ম অনুসারে গুরু ঠাকুর এলেন কেশবকে মন্ত্রে দীক্ষা দিতে। দীক্ষাদানের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। আত্মীয় স্বজন সব এসেছেন। অনেক লোক খাবে। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন তাঁর দেখা নেই। তিনি বাড়ীতেই এলেন না। এ সময় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ি প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সেদিন তিনি অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন। গুরুঠাকুর হতাশ হলেন। মা দুঃখ পেলেন, আত্মীয়রা অবাক হলেন, কিন্তু কেশব দৃঢ়তার সঙ্গে দীক্ষা নিতে অস্বীকার করলেন। যতবার অনুরোধ করে ততবারই তিনি 'না' বলেন। অভিভাবকরা রাগলেন কিন্তু কিছু করতে পারলেন না।

কেশব সামান্য যুবক নন। যিনি নিজে হরিমন্ত্রে নববিধানে লোককে দীক্ষা দিতে এসেছেন, তিনি সাধারণ লোক নন।

এর মধ্যে একদিন কেশবচন্দ্র গোপনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। মা পুত্রের কাজে বাধা দিলেন না। বরং উৎসাহই দিলেন। ক্রমে ক্রমে কেশব ব্রাহ্মসমাজের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠলেন। সমাজের নানা সংস্কার করলেন। ধর্মপ্রচারে মন দিলেন।

অপর দশজন যুবকের মত কেশব নন। বাড়ির লোকেরা চান কেশব সাধারণ লোকের মত আচরণ করুন। ঘর সংসার করুন, চাকরী করুন,জীবনে উন্নতি করুন। বাড়ির লোকেরা চেষ্টা চরিত্র করে তাঁকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ঢোকালেন। কেশবচন্দ্র বাধ্য হলেন তিরিশ টাকা বেতনের চাকরী নিতে, ব্যাঙ্কের সাহেব কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু এ চাকরী তিনি বেশি দিন করলেন না। যিনি ঈশ্বরের দাস তিনি অন্যের দাসত্ব করবেন কি করে? তিনি মানুষের দাসত্ব থেকে, সংসারের দাসত্ব থেকে চিরতরে মুক্তি নিলেন। ঈশ্বরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন। কলুটোলার কেশবচন্দ্র হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

······রত্নগিরির রত্নছেলে······

অপূর্ব তার স্বদেশ ভক্তি
দিব্য তেজের অভিব্যক্তি
নিষ্ঠা-চরম পরমা শক্তি
অনন্ত মহাপ্রাণ—

—কবি জয়গান করেছেন এক ভারত-সন্তানের। দেশভক্তি তাঁর অতুলনীয়; এই 'অনন্ত-মহাপ্রাণ' তেজস্বী ব্যক্তি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। তাঁর মৃত্যুঞ্জয় স্পর্শে জেগেছে জীবন ভারতবর্ষে। ত্যাগের তিলকে ললাট তাঁর দীপ্ত! স্বাধীন স্বরাজ্য ছিল তাঁর আজন্ম স্বপ্ন। দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য বার বার কারাবরণ করেছেন। 'বন্দীর গৃহ মন্দির তাঁর।' সারা ভারতের কল্যাণ কামনা ছিল তাঁর আজন্ম ধ্যান। স্বরাজ, স্বদেশ তাঁর জীবনের তপ, জপ, সাধনা।

দক্ষিণ ভারতের রত্নগিরি জেলা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। মারাঠা রাজ্য ভারতবর্ষের গৌরব। সেই মারাঠা রাজ্যের পেশোয়ারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। প্রথম পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ ভারত-ইতিহাসের এক স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁর জন্ম এই রত্নগিরিতে। এই বালাজি বিশ্বনাথের বংশে সেদিন জন্মগ্রহণ করেন এক অগ্নিশিশু। সারা ভারতে সেদিন আগুন জ্বলছে। বিদ্রোহের আগুন। সিপাহীদের ভারত-ব্যাপী বিদ্রোহ। প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ। সেদিন বাংলার ব্যারাকপুর ছাউনির মঙ্গল পাণ্ডে যে আগুনে পুড়ে মরেছিলেন, সেই আগুন জ্বলে উঠল সারা ভারতে দাউ দাউ করে। ইংরেজ! ভারত ছাড়। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, ঝান্সীর লক্ষ্মীবাই—এঁরা ছিলেন সেই বিদ্রোহের পুরোভাগে।

বিদেশী শাসক সেদিন ভয়ে কম্পমান। ঠিক এমনি দিনে এলেন এই অগ্নিশিশু; সারা জীবন তিনি মনে প্রাণে সেই আগুন বয়ে বেড়িয়েছেন। রত্নগিরির গরীব শিক্ষক গঙ্গাধর পন্থের ঘরে ১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই, তিলক বিদ্রোহের আগুন বুকে নিয়ে জন্ম নিলেন। সেদিন কেউ ভাবতেও পারেনি নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপীর অসম্পূর্ণ কাজের ভার এসে পড়বে এই শিশুর ওপর।

দরিদ্র শিক্ষক গঙ্গাধর পন্থ। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন। দীর্ঘ দশ বছর একটানা কাজ করলেন। কিন্তু কোন পদোন্নতি হল না। কারণ তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। ইংরেজ প্রভুদের তোষামোদ তিনি কোনদিন করতেন না। অথচ তাঁর মত অতবড় পণ্ডিত শিক্ষা-বিভাগে কেউ ছিল না। সেজন্য তিনি কিন্তু কোনদিন কাজে ফাঁকি দেননি। অবশেষে দশ বছর পরে ১৮৬৬ সালে তাঁকে সহকারী ইনস্পেক্টর করা হয়। বদলি হয়ে চলে এলেন পুণায়। এই সময় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সতী সাধ্বী নারী ছিলেন তিলকজননী।

তিলক ছোটবেলায় কোন বিদ্যালয়ে যান নি। বাবাই তাঁকে কোন স্কুলে পাঠান নি। তাঁর ধারণা প্রকৃত শিক্ষা স্কুলে হয় না। তাই বাড়িতেই নিজের কাছে রেখে তিলকের পড়ার ব্যবস্থা করেন। দশ বছর বয়স পর্যন্ত তিলক বাড়িতেই বাবার কাছে পড়লেন। বাড়িতে বসেই সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষা শিখলেন। বাবার প্রিয় বিষয় অঙ্ক; তিলকও অঙ্কে খুব পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

পুণায় এলেন গঙ্গাধর পন্থ। একটি নিম্ন-বিদ্যালয়ে তিলককে ভর্তি করে দিলেন। অতি অল্পদিনেই সেখানকার পড়া শেষ করলেন। ভর্তি হলেন পুণা হাইস্কুলে। অঙ্কে তাঁর অসাধারণ মাথা। পুরো অঙ্ক কোনদিন তিনি খাতায় করতেন না। যে কোন

অঙ্ক মনে মনে কষে খাতায় কেবল উত্তর লিখতেন। অঙ্কের শিক্ষকের নিকট তিনি ছিলেন এক মস্ত রহস্য। শিক্ষক জিজ্ঞেস করেন নিয়মটি কোথায়? তিলক কেবল নিজের মাথাটাই দেখিয়ে দিতেন। শিক্ষকরা সন্তুষ্ট হন না, ভাবেন ছেলেটি ভীষণ অহঙ্কারী। তাঁরা তিলককে ভুল বুঝলেন।

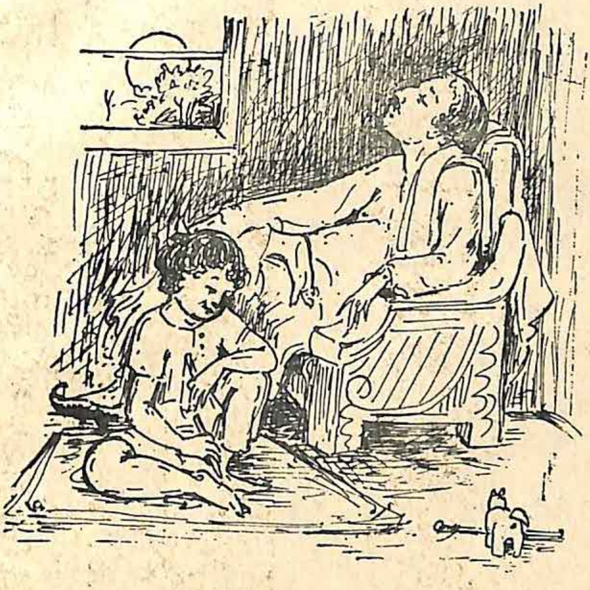
বিত্যালয়ের অন্য ছেলেদের সঙ্গে তিলকের কোন মিল নেই। অন্যেরা যখন পাশের পড়া পড়ে, তিলক কিন্তু তখন সত্যিকারের শিক্ষালাভে ব্যস্ত; পরীক্ষা পাশের পড়া নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি চাইতেন আরো পড়তে, আরো জানতে। জানবার কি শেষ আছে? নোট পড়ে পাশ করার ছাত্র তিনি ছিলেন না। এ ধরনের ছেলেকে সাধারণ নিয়মে ফেলা যায় না। কিন্তু শিক্ষকরা সেই ভুলটাই করেছিলেন।

কিন্তু বাবা চেনেন তাঁর ছেলেকে। তিনি কিন্তু ভুল বোঝেন না। শিক্ষকরা তিলকের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ নিয়ে আসেন গঙ্গাধরের কাছে। শুনে তিনি হাসেন; বলেন, 'ওর জন্যে চিন্তা করবেন না; ও ঠিক পথেই চলেছে।' শিক্ষকরা আর কিছু বলতে সাহস করেন না। তিলক নিজের ইচ্ছেমত চলেন। কেউ তাঁকে আর ঘাঁটায় না।

বাবা একদিন 'কাদম্বরী' পড়ছেন। সংস্কৃতে লেখা সবচেয়ে কঠিন বই এটি। তিলক তখন দশ বছরের বালক মাত্র। 'আমায় বইটা দাও না বাবা, আমি পড়ব।' ছেলের কথা শুনে বাবা তো অবাক্। বলে কি তিলক! 'এ বই তুই-বুঝবি কি করে?'

'কেন বুঝব না, আমি তো সংস্কৃত শিখেছি! অনেক শ্লোকও মুখস্থ করেছি।' হেসে ফেলে গঙ্গাধর। 'গীতগোবিন্দের' সহজ সংস্কৃত শ্লোক তিলক মুখস্থ করেছে, তাই বলে কাদম্বরী? যাই

হোক, বাবা কিন্তু তিলককে হতাশ করলেন না। তিনি বললেন, 'এই অঙ্কটা যদি করতে পার, তবে বইটা দিতে পারি পড়তে।" একটা ভীষণ শক্ত অঙ্ক দিলেন তাঁকে। তিনি ভাবতেও পারেন নি' তিলকের বয়সী ছোটছেলে এত কঠিন অঙ্ক পারবে! কিন্তু আশ্চর্য! অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তিলক। দেড় ঘন্টা পরে



একটা ভীষণ শক্ত অঙ্ক দিলেন তাঁকে।

অঙ্কটা করে হাসিমুখে বাবাকে দেখালেন। বাবার মুখে আর কথা নেই। দশ বছরের ছেলের একি মেধা! কাদম্বরী নিয়ে পড়ে ফেললেন; সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার! বাবা আনন্দে জড়িয়ে ধরেন ছেলেকে। এমন ছেলে পেয়ে মা গর্বিত। আর দিদি মনে করলো ভাই তার বিশ্ব জয় করবে। হ্যাঁ, তিলক বিশ্ব জয় করেছিলেন। সারা বিশ্ব তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে—'তুমি ধন্য, তুমি লোকমান্য।'

দক্ষিণ ভারতের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে তিলক। বংশের নিয়ম অনুযায়ী অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। মাত্র পনের বছর বয়স তখন। মেয়ের নাম তপিবাই। তখনো তিলক প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন নি। বিয়ের অল্পদিন পরেই তিনি হারালেন তাঁর বাবাকে। মাকে হারিয়েছেন আরো অনেক আগে। অসহায় বালক তিলক। সংসারের জটিল সমস্যা তাঁর সামনে। কোন অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। কিন্তু বাধ্য হয়ে তিলক নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে সংসারে প্রবেশ করলেন। ফল কিন্তু ভালই হলো। অনেক ভাল গুণ তিনি লাভ করলেন। নিজের ওপর তাঁর বিশ্বাস এলো, দৃঢ়তা এলো। তিনি দূরদর্শী হলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে নিজের চেষ্টায় ভর্তি হলেন ডেকান কলেজে। কলেজে ঢুকে বুঝতে পারলেন পরাধীন দেশের শিক্ষার কি চেহারা! দেখলেন ছাত্রদের কি দুর্দশা! বিদেশী ভাষা ইংরেজীই হলো শিক্ষার মাধ্যম। এই ভাষা আয়ত্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অন্য বিষয় ভাল করে শেখা হয় না। স্বাধীন চিন্তা শক্তি লোপ পায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তিলক সব দেখলেন, বুঝলেন। কলেজে ঢুকে তিনি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিলেন। দূরে সরিয়ে রাখলেন ইংরেজি বই। অন্যেরা যখন ইংরেজি মুখস্থ করতে ব্যস্ত, তিনি তখন সাঁতার কাটেন, দৌড়-ঝাঁপ করেন। কুস্তি করেন। স্বাস্থ্য রক্ষায় মন দিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর শরীর সবল, দৃঢ়, মজবুত হলো। এক বছর ধরে শরীর সাধনা করলেন। লোহার মত শক্ত হল তাঁর পেশী, মন হল ইস্পাতের মত শক্ত। 'জীবন যুদ্ধের' জন্য তৈরী হলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে তিনি অনেকবার কারা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন,—কিন্তু কোনদিন তাঁর শরীর খারাপ হয় নি।

শরীর চর্চায় মন দেওয়ায় পড়াশুনায় অবহেলা হল। ফলে আই, এ, পরীক্ষায় ফেল করলেন। তিনি কিন্তু মোটেই মন খারাপ করলেন না। পর বছর পাশ করলেন। কলেজে পড়াশুনার সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ে তাঁর উৎসাহ। বিতর্ক সভায় যোগ দিলেন। বিতর্ক ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাত থেকে চেনা-অচেনা কেউ রেহাই পেত না। বন্ধুরা তাই তাঁর নাম দিয়েছিল, 'মিষ্টার ব্লান্ট'—ম্যানে ঠোঁটকাটা লোক।

তিলক তখন বি, এ, পড়েন। এমন সময় মহারাষ্ট্রে পর পর তিনটি ঘটনা ঘটে। এই তিনটি ঘটনা তিলকের চরিত্রে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর জীবনের গতিপথ ঠিক করে দিল এই তিনটি ঘটনা।

মারাঠার স্বাধীন রাজ্য বরোদা। রাজা মলহর রাও গায়কোয়াড়। খুব সম্মানিত ব্যক্তি। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ার থাকেন বরোদায়। ফেয়ার খুব উদ্ধত, গর্বিত, অহঙ্কারী ইংরেজ। পরাধীন ভারতবাসীকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনা। এমন কি রাজা মলহর রাওকে পর্যন্ত সে সন্মান দেখায় না। ক্রমে ফেয়ারের সঙ্গে গণ্ডগোল দেখা দিল। ফেয়ারের কোন ভয় নেই। তার পিছনে আছে ইংরেজ সরকার। সে মহারাজের বিরুদ্ধে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করলো। সে অভিযোগ করলো মহারাজ হীরের গুঁড়োর বিষ জলে মিশিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগে মহারাজের বিচার হল। কোন দোষ প্রমাণিত হল না তবুও তাঁকে রাজ্য হারাতে হল।

সারা মারাঠা এই ঘটনায় আন্দোলিত হল। তিলক দেখলেন পরাধীন দেশে মহারাজাদেরও সন্মান নেই। সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। বুঝলেন পরাধীন জাতি কত অসহায়! তাদের

প্রাণের মূল্য নেই, সম্মান নেই। তিনি মনে বড় আঘাত পেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অবস্থা তিনি সহ্য করবেন না। এ গ্লানি থেকে ভারতকে বাঁচাতে হবে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে পরের বছর। বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে এক নবীন যুবক। কিছু সঙ্গী নিয়ে হঠাৎ তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। অতি সামান্য তাঁর শক্তি। ফাড়কে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নি। লোক বল নেই, সৈন্য বল নেই। অতি সহজেই বিদ্রোহ দমন করল ইংরেজ সরকার। তিলক অবশ্য ফাড়কের এই বোকার মত কাজকে সমর্থন করলেন না; কিন্তু এই সামান্য ঘটনা তিলকের মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিল। ফাড়কের সাহস ও দেশপ্রেমকে প্রণাম জানালেন তিনি।

আরো এক বছর পরে আর একটি ঘটনা ঘটে। দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মারাঠায়। না খেতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। ইংরেজ সরকারের সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। বরং তারা উৎসবে মেতে উঠল। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে কাইজার-ই-হিন্দ্ উপাধি দেওয়া হবে। সেই উপলক্ষে উৎসব। তিলক ভাবলেন পরাধীন ভারতবাসীর জীবনের মূল্য কত তুচ্ছ! লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন মরণ সমস্যা, একমুঠো ভাতের জন্য আর্ত চিৎকার। কিন্তু সরকার বাহাদুর নির্বিকার। ভারতবাসী মরছে তাতে তাদের কি!

এই তিনটি ঘটনাই প্রবল নাড়া দিয়ে গেল তিলককে। দুঃখী মায়ের দুঃখ দূর করার ব্রত নিলেন তিনি। ভারত-উদ্ধার হল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

১৮৭৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করলেন। ১৮৭৯ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তিলকের ছাত্র জীবন শেষ হলো। ডেকান কলেজে তাঁর প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন

এরপর তাঁরা কি করবেন। জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোন্ পথে চলবেন তাঁরা? দু জনেই ঠিক করলেন –

দেশসেবাই হবে তাঁদের জীবনের ব্রত। দেশকে জাগাতে হবে। অসহায় ভাবে ইংরেজের হাতে মার খাওয়া আর চলবে না। কিন্তু কোন্ পথে ভারতবাসীকে জাগানো যাবে? শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষার আলোকে সারা ভারত জেগে উঠবে। এত দিন যে শিক্ষা ইংরেজ দিয়েছে তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। একশো বছরের ইংরেজী শিক্ষার কুফল আজ সর্বত্র। ভারতবাসীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। তিনি বললেন ইংরেজি শিক্ষা অবশ্যই শিখতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান জানতে হলে ইংরেজী শিক্ষা নিতেই হবে। কিন্তু তার সঙ্গে চাই দেশীয় শিক্ষা। দেশের ঐতিহ্য, ভাবধারা, কৃষ্টি জাতীয়তাবোধ সব কিছুই শেখাতে হবে। শেখাতে হবে দেশকে ভালবাসতে। এই নতুন চিন্তাধারা নিয়ে তিনি স্থাপন করলেন 'নিউ ইংলিশ স্কুল'। ১৮৮০ সালের ২রা জানুয়ারী পুণায় এই স্কুল স্থাপিত হয়। একদল দেশপ্রেমিক কর্মী তিলকের কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিলক 'কেশরী' ও 'মারাঠা' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমেও তিলক দেশকে জাগানোর কাজে রত হলেন।

জীবনের সংগ্রামী পথ বেছে নিলেন লোকমান্য তিলক। দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন।

মহাশক্তির দীপ্ত আভাতে,
ভারতের ভালে নূতন প্রভাতে
দিয়াছিল জয়-টীকা।

———

......কপোতাক্ষতীরের সেই ছেলেটি......

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত, তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;

—অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিদেশে বসে জন্মভূমি বাংলার এক নদীর কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। সে নদী কপোতাক্ষ। কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে। খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদ। সবুজে সবুজে শ্যামল করেছে দুই তীর, উর্বরা করেছে দুই তীরের জমি। সদা চলমান এই নদ। উন্মুখ হয়ে এগিয়ে চলেছে মহাসাগরে মিলে ধন্য হতে। কত সাহিত্যিক, কত জনদরদী মহামানবের—স্মৃতি বয়ে চলেছে এই নদ। মাইকেলের লেখনীতে অমর হয়ে আছে এই নদ। এই নদের তীরে সাগর-দাঁড়ি গ্রাম। মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি। এরই তীরে কাটি পাড়া গ্রাম, মধুসূদন-জননী জাহ্নবীদেবীর পিতা গৌরীচরণ ঘোষের বাড়ি। বিখ্যাত সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের জন্মস্থান পলুয়া-মাগুরা গ্রাম এই নদেরই তীরে। এরই তীরে রাড়ুলি গ্রাম। এই রাড়ুলি গ্রামে উজ্জ্বল করে জন্ম নিলেন এ কালের বিস্ময় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সাল ১৮৬১, তারিখ ২রা আগষ্ট। এই বছরটি বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ, নীল রতন সরকার, ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়, জলধর সেন, বিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মনীষীর জন্ম এই সালেই। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ-কাব্য-ও এই সময়—প্রকাশিত হয়। রসায়ণ শাস্ত্রের ইতিহাসেও এ বছরটি চিরস্মরণীয়। এ বছরেই ক্রুকস স্যালিয়ম আবিষ্কার করেন।

কবির কথায়—

নব নালান্দা তব চারিপাশে আবার লভিছে মূর্তি
তোমার সামারে নাগার্জুনের ব্রত ধরিয়াছে মূর্তি।
—নবভারতের-নাগার্জুন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

তখন মুসলমান আমল। ১৪৫০ সালে পীর খাঞ্জা আলি খুলনা জেলার বাগের হাটের কাছে বিখ্যাত 'ষাটগম্বুজ' মসজিদ নির্মাণ করেন। আরো দক্ষিণে চাঁদখালির কাছে আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, কপোতাক্ষ তীরে। দীর্ঘদিন মসজিদটি সুন্দর বনের গহন বনে ঢাকা পড়ে ছিল। পরে বন কেটে বসত করার সময় মসজিদটি দেখা যায়। গ্রামের নাম হল 'মসজিদকুঁড়'। দিল্লীর সম্রাট তখন জাহাঙ্গীর বাদশাহ। এই সময় প্রফুল্ল চন্দ্রের কোন এক পূর্ব পুরুষ এই গ্রামে এসে বাস করেন। তাঁর অনেক জমি-জায়গা, তাঁর জায়গির ছিল আশে পাশের গ্রামগুলিতে।

প্রফুল্লচন্দ্রের ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন মানিক লাল রায়। তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। প্রথমে ছিলেন নদীয়ার কালেক্টারের দেওয়ান। পরে যশোহরের কালেক্টারের দেওয়ান। তখন খুলনা জেলার জন্ম হয় নি। যশোহরের অধীন ছিল। মানিক লাল এই উচ্চপদে থেকে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হন। শোনা যায় হাঁড়ি হাঁড়ি সিক্কা টাকা বাঁশের ভারে ঝুলিয়ে তাঁর বিশ্বাসী লোকেরা দেশের বাড়িতে আনত। ডাকাতদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য হাঁড়ির মুখ বাতাসা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। মানিক লাল রাড়ুলি অঞ্চলে বিরাট জমিদারী কেনেন। এ ছাড়া অনেক টাকা ব্যাঙ্কে রাখেন। ব্যাঙ্কটির নাম পামার এণ্ড কোং। কিন্তু হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁর টাকা মারা গেল। কিন্তু মানিকলাল ভেঙে পড়েন নি। তখনকার প্রথামত তিনি অনেক টাকা মাটির তলায় পুঁতে রেখে ছিলেন।

প্রফুল্ল চন্দ্রের ঠাকুর্দা আনন্দলাল রায়। তিনিও যশোহরের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনিও এই টাকা পয়সা আয় করেন।

প্রফুল্ল চন্দ্রের বাবা হরিশচন্দ্র রায়। জন্ম তাঁর ১৮২৬ সালে।

মধুসূদনের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। 'পারসী' ভাষা তখন ছিল আদালতের ভাষা, তিনি এক মৌলবীর নিকট 'পারসী' ভাষা শেখেন। আরবীও জানতেন তিনি। গ্রামের পড়া শেষ হলে তিনি এলেন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তে ১৮৪৬ সালে। তখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয় নি। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ক্যাপ্টেন ডি. এল, রিচার্ডসন। বিখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। দুর্ভাগ্য হরিশচন্দ্রের। কলেজের পড়া শেষ না করেই তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়। হরিশচন্দ্র ছিলেন বাবার একমাত্র জীবিত পুত্র। আনন্দলাল চাকরির জন্য যশোহরে থাকেন। বাড়ির জমি-জমা দেখাশুনা করে কে? অগত্যা হরিশচন্দ্রকে বাড়ি ফিরে জমিদারী দেখা শুনার দায়িত্ব নিতে হল। অবশ্য আর একটি কারণ হয়ত ছিল। কিছুদিন আগে সাগর দাঁড়ি গ্রামের ছেলে মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়ে গেছেন। সংবাদটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মা-বাবারা চিন্তিত। আনন্দলালের মনে ভয়! তাঁর ছেলেও যদি ধর্মত্যাগ করে! কলকাতার ঢেউ কৃষ্ণনগরে যেতে কতক্ষণ। না বাপু, দরকার নেই বেশি লেখা-পড়া শিখে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এস। হরিশচন্দ্রকে ঘরেই ফিরতে হল।

হরিশচন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও খুব মেধাবী ছিলেন। তিনি আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরাজি খুব ভালই জানতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর খুব অনুরাগ। সেই সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা 'তত্ত্বাবোধিনী', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'হিন্দু পত্রিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিক', সোমপ্রকাশ' প্রভৃতির নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এছাড়াও তাঁর লাইব্রেরিতে ভাল ভাল বই ছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বন্ধু ছিলেন তিনি। তিনি গান ভালবাসতেন। ভাল বেহালা বাজাতে

পারতেন। তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন গ্রামে দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—একটি বালিকাদের জন্য অন্যটি বালকদের জন্য। অর্থনীতিতে বেশ দক্ষ ছিলেন। বাড়িতে লোন অফিস খোলেন। হরিশচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে হয়েও খুব উদার ছিলেন, সংস্কার মুক্ত ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মা ভুবনমোহিনী দেবী। তিনি লেখাপড়া না জানলেও উদার ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাত যাত্রায় তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে থাকতেন। তখন ভুবনমোহিনীর লেখা-পড়া শেখারও ব্যবস্থা করেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও ভুবনমোহিনীকে বাংলা পড়া শিখতে সাহায্য করেছিলেন।

হরিশচন্দ্র সে সময়ের সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। সেজন্য গ্রামের অশিক্ষিত, আধাশিক্ষিত লোক তাঁকে ম্লেচ্ছ বলত। একবার তাঁরই বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে বিধবা-বিবাহ দেবেন বলে ঠিক করলেন। চারদিকে ছি ছি পড়ে গেল। আনন্দলাল ছেলের কু-কীর্তির কথা শুনে দ্রুত বাড়ি ফিরে সে বিয়ে বন্ধ করে দেন। এই—বিধর্মী কাজের শাস্তি স্বরূপ তাঁকে সকলে 'বয়কট' করল। তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে অনেকেই—যোগ দেয় নি। সাতক্ষীরার জমিদার উমানাথ রায় ছড়া বাঁধলেন—

হা কৃষ্ণ, হা হরি এ কি ঘটাইল,
রাড়ুলি টাকীর ন্যায় দেশ মজাইল।

প্রফুল্ল চন্দ্ররা চার ভাই ও এক বোন। বড় জ্ঞানেন্দ্রনাথ, মেজ নলিনীকান্ত, সেজ প্রফুল্লচন্দ্র, ছোট পূর্ণচন্দ্র ও বোন ইন্দুমতী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ডায়মণ্ডহারবারে ওকালতি করতেন, নলিনীকান্ত দেশে

জমিদারী দেখাশুনা করতেন, পূর্ণচন্দ্র ডাক্তারি পাশ করে দেশে ডাক্তারি করতেন। ইন্দুমতীর বিয়ে হয় কলকাতায়।

গ্রামের পাঠশালায় প্রফুল্লচন্দ্রের পড়াশুনা শুরু। এই যে তাঁর ছাত্রজীবন শুরু, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে ছাত্র বলেই ভেবেছেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—"আজো আমি জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া থাকি। আজীবন আমি ছাত্রভাবে আছি। কখন যে আমার শৈশব কৈশোর ও যৌবন চলিয়া গিয়াছে, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই। আজ বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়া আমি সেই ছাত্রই আছি।" প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে মাইনর পরীক্ষা শেষ করেছেন। উভয়ে এম. ই. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে হরিশচন্দ্রের সদাসতর্ক দৃষ্টি। ছেলেরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা পায়, উচ্চশিক্ষা পায়—এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু গ্রামে সে সুযোগ কোথায়? তাই ছেলেদের কলকাতা আনা দরকার।

কলকাতায় তখন ভাল মেস ছিল না। সমস্যা দেখা দিল ছেলেদের কোথায় রাখা যায়? হরিশচন্দ্রের সামনে দুটি পথ খোলা। এক বাসা ভাড়া করে কোন অভিভাবকের অধীনে ছেলেদের রাখা না হয় তাঁকে নিজেই কলকাতায় এসে ছেলেদের দেখাশুনা করতে হবে। কিন্তু হরিশচন্দ্রের পক্ষে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা আশা অনেক অসুবিধা। জমিদারী দেখাশুনা আছে, তাছাড়া আছে ব্যাঙ্কিং; ও মহাজনী কারবার। হরিশচন্দ্র মহা সমস্যায় পড়লেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল। অবশেষে ঠিক হল—ছেলেদের ভবিষ্যৎ আগে। তাদেরকে মানুষ করাই জরুরী। তাই স্থির হল প্রফুল্লচন্দ্রের বাবা-মা দু জনেই ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় থাকবেন। ১৮৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। হরিশচন্দ্র ছেলেদের নিয়ে কলকাতা

এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তখন ন বছরের বালক মাত্র। কলিকাতার চাঁপাডাঙ্গা অঞ্চলে ১৩২নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বাসা ভাড়া করলেন। দীর্ঘ দশ বছর এ বাড়ীতে ছিলেন তাঁরা। রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি কাছেই। আর কেশব সেনের প্রতিষ্ঠিত নূতন ব্রাহ্ম সমাজের বাড়ীও কাছেই।

উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য গ্রামের ছেলে প্রফুল্ল চন্দ্র এলেন শহর কলকাতায়। একদা বীরসিংহের 'সিংহশিশু' ঈশ্বরচন্দ্রও এসেছিলেন, এসেছিলেন সাগরদাঁড়ি গ্রাম থেকে মধুসূদন, এসেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় কোম্পানীর শহর কলকাতায়। উদ্দেশ্য সেই উচ্চশিক্ষালাভ।

গ্রাম থেকে সবে এসেছেন কলকাতায়। অবাক হয়ে যান। বিস্ময়-ভরা চোখে দেখেন শহর কলকাতা। যত দেখেন ততই বিস্মিত হন। নতুন নতুন রহস্য চোখের সামনে দেখেন। সবে তখন জলের কল এসেছে শহরে। গোঁড়া হিন্দুরা এ জল ব্যবহার করবে কি করবে না-এ নিয়ে ইতস্তত করছে। মাটির নিচের ড্রেন তৈরী সবে শুরু হয়েছে। হুগলী নদীতে দু-একটা বড় স্টীমারের আনাগোনা। আর অসংখ্য—পালতোলা জাহাজ। হাইকোর্ট আর যাদুঘরের বাড়ি শেষ হতে চলেছে। চিড়িয়া খানা ছিল না। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্যালেসে একটা চোটখাটো চিড়িয়াখানা ছিল। অনেক দর্শকের ভিড় সেখানে।

প্রফুল্ল চন্দ্র দেখেছিলেন সেকালের বাঙালীরা একালের মত চাকুরী প্রিয় ছিল না। তারা ব্যবসা বাণিজ্যে খুব নাম করেছিল। কলকাতার আদি পর্বে—মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, অক্রুর দত্ত ও আরো অনেকে ব্যবসা করে কোটি পতি হয়েছিলেন। আরো পরে শিবকৃষ্ণ দাঁ, প্রাণকৃষ্ণ লাহা ব্যবসাক্ষেত্রে সফল হন। হিন্দুকলেজের

প্রতিভাধর ছাত্র এবং ডিরোজিওর শিষ্য রামগোপাল ঘোষ চাকুরী না করে এক ইংরেজের সঙ্গে 'কেলসাল ও ঘোষ' নাম এক কোম্পানী খোলেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের মত লোক চাকুরী মোহে না ভুলে ব্যবসা করেন। এ ছাড়া বহু বাঙালী ব্যবসায়ী ফার্মের যুৎসুদ্দি ছিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল চন্দ্র দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন একালের বাঙালীর ধ্যান-জ্ঞান চাকুরী।

হরিশচন্দ্র ছেলেদের ভর্তি করে ছিলেন বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে। হেয়ার স্কুল তখন ভবানী দত্ত লেনে—এখন সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগ। ন বছরের প্রফুল্ল চন্দ্র দাদার সঙ্গে নিয়মিত স্কুলে যান। প্রথম প্রথম শহরের শহপাঠীরা তাঁকে 'বাঙাল' বলে উপহাস করত। যশোহরের (তখন খুলনা জেলা হয় নি) ছেলে! কিন্তু তিনি জানতেন যশোহর জেলা ফেলনা নয়। মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস ছিল এ জেলারই প্রজা প্রতাপাদিত্য ও রাজা সীতারাম রায়ের। বাংলার মিলটন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এ জেলারই গৌরব।

স্কুলের পাঠ্যবই পড়ে প্রফুল্লচন্দ্রের মন ভরে না। নানা ধরনের বই পড়েন তিনি। বিশেষ করে ইতিহাস ও জীবন চরিত ছিল তাঁর খুব প্রিয়। চেম্বার, নিউটন, গ্যালিলিও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীনের জীবনী ছিল তাঁর অতি প্রিয়। প্রফুল্ল চন্দ্র যখন কলকাতা এলেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের স্বর্ণযুগ। চিন্তা রাজ্যে নানা পরিবর্তন। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন—ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের বিরাট প্রভাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ—এ সবই প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে নানা ভাবে প্রভাব ফেলে। প্রফুল্ল চন্দ্রের মানস গঠনে তাঁর সংস্কারযুক্ত বাবা, কেশব সেন, ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রভাব অপরিসীম। প্রফুল্লচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়েন চিন্তা রাজ্যে নতুন নতুন দিক খুলে যায়। যেখানে কেশব সেনের বক্তৃতা সেখানেই প্রফুল্লচন্দ্র।

হেয়ার স্কুলে তাঁর অন্য যে সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী! কিন্তু এই স্কুলে তাঁর বেশিদিন পড়া হলো না। ১৮৭৪ সাল, চতুর্থ শ্রেণীর (বর্তমানে সপ্তম শ্রেণী) ছাত্র তিনি। এই সময়ে কঠিন রোগে পড়লেন। রক্ত আমাশয়। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। দীর্ঘ সাত মাস এই কঠিন রোগে ভুগলেন। প্রফুল্ল চন্দ্রের সুন্দর স্বাস্থ্য জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেল। চিরদিনের মত হজম শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। সাতমাস সুস্থ হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় হন নি। ১৮৭৫ সাল থেকে জীর্ণ-ব্যাধিরূপে চিরজীবন তাঁর সাথী হল। ফলে তাঁর ভাল ঘুম হতো না, পেটের পীড়া লেগেই থাকতো। স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও তাঁর মনোবল ছিল অসাধারণ।

এই কঠিন পীড়া কিন্তু প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে শাপে বর হল। স্কুলের গতানুগতিক পড়ার হাত থেকে মুক্তি। নিজের ইচ্ছামত পড়ার মস্ত সুযোগ এখন। ইংরেজি সাহিত্যের নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন। পড়লেন সেক্সপীয়ার গোল্ডস্মিথ, জনগণের লেখা। বাংলা সাহিত্যের নানা দিকেও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি। বঙ্কিম চন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' পড়েন বঙ্গদর্শনে নিয়মিত। পড়েন প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তাঁর যুগ'। রামদাস সেনের 'কালিদাসের যুগ' রাজেন্দ্র লাল মিত্রের 'বাঙ্গালীর সেন রাজগণ'; মন তাঁর চলে যায় অতীতে। তখনকার বিখ্যাত সব পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ, অমৃত বাজার পত্রিকা' হিন্দু-পেট্রিয়ট্' নিয়মিত পড়েন। বাড়ির লাইব্রেরীতে Principia Latina' বইটির প্রতি তাঁর বড় লোভ। কিন্তু বইটি যে ল্যাটিন ভাষায় লেখা। তাতে কি হয়েছে! নিজের চেষ্টাতেই ল্যাটিন শিখলেন। বইটি পড়ে বিস্মিত হলেন, পুলকিত হলেন। দেখলেন

ল্যাটিন ও সংস্কৃত এই দুটি প্রাচীন ভাষার মধ্যে বেশ মিল। ল্যাটিনের মত ফরাসী ভাষা নিজে নিজে শিখে ফেললেন। আর ইংরাজী ভাষা তো ছিল তার অতি প্রিয়।

রক্তামাশয় মোটামুটি সারল। এর মধ্যে কেটে গেছে দু দুটি বছর। ভর্তি হলেন কেশব সেনের অ্যালবার্ট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানের অষ্টম শ্রেণী)। কেশব সেনের ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী ছিলেন প্রধান শিক্ষক। এই স্কুলে প্রফুল্ল চন্দ্র তাঁর মনের মত পরিবেশ পেলেন। এখানকার শিক্ষকদের খুব কাছে এসেছিলেন। খুব কাছ থেকে তাঁদের দেখেছেন, মিশেছেন। তাঁদের ভালবাসা পেয়েছেন। অ্যালবার্ট স্কুলের আদর্শ-শিক্ষকদের তিনি আজীবন মনে রেখেছিলেন। এই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আর এই সময়ে হরিশচন্দ্র পড়লেন খুব সমস্যায়। আর্থিক সমস্যা। একটির পর একটি জমিদারী বিক্রী হতে লাগল। বাধ্য হয়ে সংসারের খরচ কমাতে হল। কলকাতার বাসা বন্ধ করতে হল। বাবা-মা চলে গেলেন দেশের বাড়ী। প্রফুল্লচন্দ্র দাদার সঙ্গে উঠলেন ছাত্রাবাসে।

দাদা প্রেসিডেন্সি কলেজে, আর প্রফুল্লচন্দ্র ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. ক্লাশে। এই কলেজে তাঁর ভর্তি হওয়ার কারণ বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান এটি। আর এখানে পড়াতেন শুনামধন্য সব অধ্যাপক। ছাত্র সমাজের দেবতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াতেন ইংরাজি গদ্য সাহিত্য আর প্রসন্ন কুমার লাহিড়ী পড়াতেন ইংরাজি কাব্য সাহিত্য। এই কলেজে রসায়ন শাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা না থাকায় প্রফুল্লচন্দ্র বাইরের ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের ক্লাশ করতেন। বিখ্যাত পেডলার সাহেব ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর—অজ্ঞাত সারেই রসায়ন শাস্ত্র ভালবেসে ফেললেন। এসময় প্রফুল্লচন্দ্র একটা সংশয়ে পড়েন। সাহিত্য না বিজ্ঞান—কোন্ পথে যাবেন তিনি। সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করলেন তিনি। বিজ্ঞানের পথ ধরলেন।

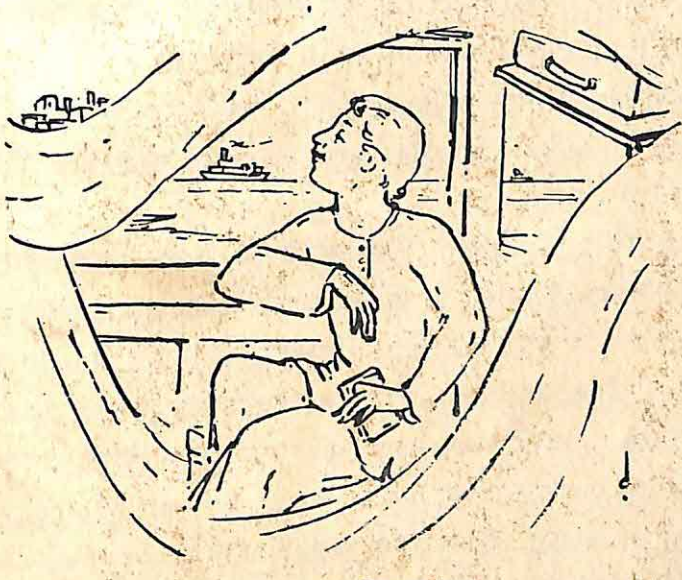
প্রফুল্লচন্দ্র এফ. এ. পাশ করলেন। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর খুব আকর্ষণ। তাই বি. এ. ক্লাশে বি. কোর্স নিলেন। তখন বি. এস. সি ছিল না। বি এ.-এর 'এ' কোর্স ছিল সাহিত্য আর 'বি' কোর্স মানে বিজ্ঞান। প্রফুল্লচন্দ্রের বাবার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর অন্ততঃ একটি ছেলে বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভ করুক। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়ল যে এ ইচ্ছা পূরণ হবার নয়।

হরিশচন্দ্র রায় এক সময়ে বই-এর ব্যবসায় নেমেছিলেন। উইলসনের ডিকসনারি ছাপিয়েছিলেন কয়েক হাজার। 'জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় অ্যাণ্ডব্রাদার্স'—এই ছিল প্রকাশকের নাম। কিন্তু বই ছাপিয়ে কয়েক হাজার টাকা লোকসান দিলেন হরিশচন্দ্র। বই বিক্রী হল না। হরিশচন্দ্র অভাবের জন্য কলকাতার বাসা তুলে দিলেন। ছেলেরা ৮০ নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। বাবা নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারেন না। প্রফুল্লচন্দ্র উইলসনের সেই ডিকসনারি জলের দরে বিক্রী না করে বাঁধাই করে তুলে রেখেছিলেন। এখন একদিন প্রফুল্লচন্দ্র দাদাকে প্রস্তাব দিলেন বই-এর দোকান খোলার। বই তো আছে। দুই ভাই পরামর্শ করে দোকান খুললেন। বাড়ির দরজায় সাইনবোর্ড টাঙালেন—'জি, সি, রায় অ্যাণ্ড ব্রাদার্স', পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, উইলসনের ডিকসনারি মাত্র ছ টাকায় বিক্রী হবে। আশ্চর্য-ফল হল। বই বেশ বিক্রী হতে লাগল। প্রফুল্লচন্দ্র উৎসাহিত হলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, কলেজের পড়া শেষ

হলে বই-এর ব্যবসায়ে নামবেন। কিন্তু তা আর তাঁকে করতে হল না।

বি. এ. পড়ার সময় তিনি মনে মনে ঠিক করলেন 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি পরীক্ষা দেবেন। 'গিলক্রাইস্ট' বিলেতের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৃত্তি। পৃথিবীর সব দেশের ছাত্র এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে পারে। এডিনবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয় এই পরীক্ষা নেন এবং তাঁরাই ফল প্রকাশ করেন। প্রফুল্ল চন্দ্র গোপনে এই পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। একমাত্র তাঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র এ সংবাদ জানতেন। এই পরীক্ষায় পাশ করতে হলে ল্যাটিন, গ্রীক বা সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানা আবশ্যিক ছিল। প্রফুল্ল চন্দ্র নিজের চেষ্টায় ঐ সব ভাষা শিখে ফেললেন। যথাসময়ে তিনি 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বার হচ্ছে না। তিনি পাশের আশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় একটি খবর বার হ'ল। 'গিলক্রাইস্ট' পরীক্ষার ফল বার হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে দুটি মাত্র ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। বাহাদুরজী নামে বোম্বাই-এর এক পার্শী ছাত্র আর বাংলা থেকে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। এঁরা দুজনই ভারতের প্রথম 'গিলক্রাইস্ট' স্কলার। এতদিনে প্রফুল্লচন্দ্রের সুপ্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। তিনি বিলেত যাবেন। আনন্দিত বন্ধুরা, শিক্ষকরা, বাবা, মা—সবাই। বৃত্তি বছরে একশ পাউণ্ড। হোক সামান্য-তবু প্রফুল্লচন্দ্র দমলেন না। এতেই তিনি চালিয়ে নিতে পারবেন। বাবাকে তাঁর মনের ইচ্ছা জানালেন। বাবা সানন্দে রাজি হলেন। মাও সম্মতি দিলেন। বিলেত গেলে জাত যায় এ অন্ধ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশ যাত্রার আগে রাড়ুলিতে গেলেন। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁদের পায়ের ধূলো নেবেন। তাঁদের আশীর্বাদ হবে বিদেশে তাঁর রক্ষা কবচ।

এবার যাত্রার প্রস্তুতি। বিলেতে কেমন করে চলতে হয়, বলতে হয়, খেতে হয় তা তো তিনি জানেন না। তিনি এ সব বিষয়ে তালিম নিতে লাগলেন। বন্ধু দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলেন। কলকাতায় দু-একটা সস্তা রেস্তোরাঁতে ডিনার খাওয়া শিখতে লাগলেন। বখশিষ পেয়ে খানসামারা শিখিয়ে দেয় কি করে ছুরি-কাঁটা ধরতে হয়, কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়।



জাহাজে চড়ে বিদেশ গমন

প্রফুল্লচন্দ্রের বিদেশ যাত্রায় সঙ্গী হলেন ডা. পি. কে. রায়ের ছোট ভাই দ্বারকানাথ রায়। তিনি ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছেন। বর্ষাকাল। কলকাতার জাহাজ ঘাট। জাহাজের নাম ক্যালিফোর্নিয়া'। যাত্রা হল শুরু। বর্ষাকাল বলে যাত্রী সংখ্যা কম। জাহাজ ফলতা পর্যন্ত যেতে না যেতেই প্রফুল্ল চন্দ্র সমুদ্র পীড়ায় পড়লেন, পাঁচ-ছ দিন পরে জাহাজ কলম্বো পৌঁছল। কলম্বো থেকে এডেনের পথে তাঁকে

খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। জাহাজে প্রচণ্ড দুলুনি। সমুদ্র-পীড়া অর্থাৎ বমি বেড়ে গেল তাঁর। এক সময়ে সমুদ্র শান্ত হল, প্রফুল্ল চন্দ্রও সুস্থ হলেন। জাহাজ লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল পেরিয়ে মাল্টা, জিব্রল্টার হয়ে বিস্কে উপসাগরে পড়ল। জাহাজে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তিনি নিয়মিত বই পড়তেন। টানা ৩৩ দিন পরে জাহাজ বিলেতের গ্রেভসেণ্ড বন্দরে ভিড়ল। সেখান থেকে রেলে লণ্ডনের চার্ট স্ট্রীট স্টেশান। স্টেশানে জগদীশ চন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন দাস তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। জগদীশ চন্দ্র দু বছর আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের কাছে এক সপ্তাহ থাকলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন শহর ঘুরে ফিরে দেখলেন অবাক হয়ে।

এক সপ্তাহ পরে লণ্ডন থেকে এডিনবার্গ যাত্রা করলেন প্রফুল্ল চন্দ্র। লণ্ডন থেকে চারশ মাইল উত্তরে এডিনবার্গ। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ। প্রফুল্লচন্দ্র অক্টোবর মাসে এখানে এলেন। তখন খুব শীত। শীতের সেসন আরম্ভ হতে আর কদিন বাকী আছে। প্রফুল্ল চন্দ্র দেখলেন সুন্দর শহর এই এডিনবার্গ। আকাশ তত কুয়াশায় ঢাকা নয়। কলকারখানা কম, তাই ধোঁয়ার উপদ্রব নেই, রাস্তায় যানবাহনের অত্যাচার কম। কাছেই সমুদ্র। জন্মভূমি বাংলা থেকে সাত-সাগর তের নদীর পারে এই দেশ প্রফুল্ল চন্দ্রের মন কেড়ে নিল।

প্রফুল্ল চন্দ্র খুব কম ভাড়ায় দুখানা ঘর নিলেন। সপ্তাহে বার শিলিং ছয় পেন্স ভাড়া। কম ভাড়ায় এমন পছন্দসই ঘর পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাঁর ল্যাণ্ড-লেডি খুব ভাল মানুষ।

এডিনবার্গে প্রফুল্ল চন্দ্র খুব সরল জীবন যাপন করতেন। টাকা পয়সা বেশি খরচ করতেন না। খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। এখানকার

ছাত্রদের মিতব্যয়ী হওয়াই ছিল ট্র্যাডিসন। লণ্ডন ক্যাম্ব্রিজ ইটন হ্যারোর ছাত্রদের জীবন ব্যয়বহুল ও আড়ম্বর পূর্ণ। প্রফুল্ল চন্দ্র ছ বছর ছিলেন এডিনবার্গে। খুব সাবধানে, মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলতেন। বৃত্তির টাকাই তাঁর ভরসা। বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প কিছু টাকা আসত।

শীতের সেসনে প্রফুল্ল চন্দ্র ভর্তি হলেন প্রাথমিক বি. এস, সি, ক্লাশে। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা আর প্রাণীবিদ্যা পড়তে লাগলেন। গ্রীষ্মের সেসনে নিলেন উদ্ভিদবিদ্যা। তিনি কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলেন রসায়ন শাস্ত্রই তাঁর প্রিয় বিষয়। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ক্রাম ব্রাউন। অমায়িক, উদার ও খাঁটি ভদ্রলোক তিনি। শরীর ও কান সম্পর্কে নতুন দান ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন ফার্মাকোলজির এক নতুন শাখার প্রতিষ্ঠাতা টমাস ফ্রেজারের সঙ্গে। পড়াশুনা খুব ভাল ভাবেই চলছে। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

তখন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন লর্ড ইড্‌সলি। ইনি ১৮৬৭-৬৮ তে ভারত-সচিব ছিলেন। তখন নাম ছিল স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট। রেক্টর ১৮৮৫ সালে একদিন ঘোষনা করলেন 'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এই রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র তখন বি, এস, সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন, লেবরেটারিতে কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তবু তিনি এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে ভারত সম্পর্কে অনেক বই সংগ্রহ করলেন। মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। ফরাসী ভাষায় লেখা কিছু বই ও পড়ে ফেললেন। যথাসময়ে প্রবন্ধ জমা দিলেন। কিন্তু পুরস্কার তিনি

পেলেন না। তবু পরীক্ষকগণ তাঁর প্রবন্ধের খুব প্রশংসা করলেন। বিচারক ছিলেন স্যার উইলিয়ম মুয়র ও অধ্যাপক স্যাসন। প্রফুল্ল চন্দ্র প্রবন্ধটি নিজ ব্যয়ে ছাপালেন 'Essay on India' নামে। বিনামূল্যে পুস্তিকাটি ছাত্রদের দিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের খ্যাতনামা সদস্য জন ব্রাইটের কাছে এক খণ্ড পুস্তিকা পাঠালেন। তিনি প্রফুল্ল চন্দ্রকে সুন্দর উত্তর দিলেন। পরদিন সংবাদ পত্রে বড় বড় শিরোনাম দিয়ে সংবাদ বেরল—'ভারতীয় ছাত্রের নিকট জন ব্রাইটের পত্র।' রয়টার ভারতবর্ষেও তারযোগে সংবাদটি পাঠালেন। রাতারাতি প্রফুল্লচন্দ্র দেশে বিদেশে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। ঐ প্রবন্ধে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র খোদ বিলেতের বুকে বসে। সেদিন কিন্তু এটা ছিল কল্পনার বাইরে। তাঁর বয়স তখন সবে চব্বিশ বছর।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যাপার তো মিটে গেল। এবার বি, এস সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৮৮৬ সালে বি, এস, সি পাশ করলেন। এবার গবেষণা। D. Sc. উপাধির জন্য। রসায়ন শাস্ত্রে। ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় লেখা রসায়ন শাস্ত্রের সব বড় বড় বই পড়ে ফেললেন। যথাসময়ে 'থিসিস' বা গবেষণা প্রবন্ধ জমা দিলেন। পরীক্ষকগণ সন্তুষ্ট হলেন।

তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার মিলল। ১৮৮৭ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এস, সি উপাধি লাভ করলেন। বাংলা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন। প্রফুল্ল চন্দ্রের তের বছর আগে আর একজন মাত্র বাঙালী সন্তান এই উপাধি লাভ করেন। এবং 'ভ্যানস ডানলপ' বৃত্তি লাভ করেন। প্রফুল্ল চন্দ্রের গবেষণা-প্রবন্ধ খুব ভাল হওয়ায় তিনি 'হোপ' বৃত্তিও লাভ করেন। গিলক্রাইস্ট এনডাউমেন্টের ট্রাস্টিগণ তাঁর বৃত্তি শেষ হয়ে গেলেও সানন্দে আরো

পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র আরো এক বছর এডিনবার্গে পড়াশুনা করবেন স্থির করলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এক ক্ষীণদেহী বাঙালী ছাত্রের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ১৮৮৮ সালে শীতের সেসন শেষ হল। এবার দেশে ফেরার পালা।

বিদেশে প্রফুল্লচন্দ্র কেবল গবেষণাগারে ও ক্লাশঘরের মধ্যেই দিন কাটান নি। দেশও দেখেছেন। ছুটিতে তিনি ঘুরে ঘুরে নতুন দেশ দেখেছেন। গরমের ছুটিতে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে পার্বতীনাথ দত্ত। তাঁরা বেড়ালেন ফার্থ-অব-ক্লাইডে, মনোরম সমুদ্রতীরে। আর একবার হায়দারাবাদের এক মুসলমান ডাক্তারী ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড ভ্রমণে বার হন। ইচ্ছে পায়ে হেঁটে ঘুরবেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন কত পুরনো যুদ্ধক্ষেত্র, দেখলেন স্টার্লিং দুর্গ। সাঁতার কাটলেন লেক ক্যাট্রাটনে, বেড়ালেন লেক লমণ্ডের তীরে তীরে। এখানে এক হোটেলে থাকলেন। এখানে বসেই কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'To a Highland Girl' লেখেন। ক্যালেডোনিয়ান খালের তীরে বেড়ালেন, ফোর্ট উইলিয়মের এক কুটীরে কাটালেন, চারদিকে মনোরম দৃশ্য। ছবির মত সব সুন্দর, উঠলেন নোভিমের গিরিশৃঙ্গে, গেলেন সুন্দর ইনভারনেস শহরে। এখান থেকে গেলেন বিখ্যাত কালোডেন স্মুর। যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে। এ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রফুল্লচন্দ্র চিরকাল মনে রেখেছিলেন।

এবার দেশে ফিরবেন। দেশে ফেরার আগে তিনি একটি কাজ করলেন। ভারতে ফিরে যাতে শিক্ষা বিভাগে কাজ পান সেই চেষ্টা বিলেত থেকে করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সি,এইচ, টনি সাহেব তখন ছুটিতে বিলেতে ছিলেন।

টনি সাহেবের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় হল। অধ্যক্ষ সাহেব বাংলার শিক্ষাবিভাগের বড়কর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রকৃটের নিকট প্রফুল্লচন্দ্রের নামে এক পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। এই ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশ যাত্রা করলেন।

ফিরবার পথে কনটিনেন্টের—দেশগুলি দেখার ইচ্ছা প্রফুল্লচন্দ্রের। তাই তিনি ইটালীর ব্রিন্দিসি বন্দর থেকে—জাহাজে উঠবেন ঠিক করলেন। তিনি যাওয়ায় পথে প্যারিস দেখলেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে পথে পিসা শহরের বিখ্যাত Leaning Tower দেখলেন। ইতালি, রোম হয়ে শেষে এলেন ব্রিন্দিসি বন্দরে। সেখান থেকে পি, এণ্ড, ও কোম্পানীর জাহাজে চড়লেন।

ঠিক ছয় বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্রের জাহাজ কলকাতা বন্দরে ভিড়ল। অযথা টাকা খরচ করে দাদা বাবা কলকাতা আসবেন বলে তিনি আগে থেকে তাঁর ফিরবার তারিখটা জানান নি। কলকাতা এসে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠলেন। প্রথমেই সাহেবী পোষাক ছেড়ে ধুতি—পাঞ্জাবী পরে বাঁচলেন। তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য রাড়ুলি এলেন। শিয়ালদা থেকে রেলে খুলনা। সবে তখন রেল লাইন হয়েছে।

কতদিন পরে মা ছেলেকে দেখলেন! প্রফুল্লকে দেখে মা কেঁদে ফেললেন। ছোট বোন আর নেই। মা বিলাপ করতে লাগলেন। স্নেহের বোনের সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হবে না প্রফুল্লচন্দ্রের।

দেশে ফিরে প্রফুল্লচন্দ্রকে এক বছর অপেক্ষা করতে হল। এক বছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নে একটি সহকারী অধ্যাপকের পদ মঞ্জুর হল। বেতন মাসে ২৫০ টাকা। এই স্বল্প বেতনেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন। সাল ১৮৮৯। আরম্ভ হল তাঁর গৌরবময় কর্মজীবন।

······দুরন্ত বিলে······

সে অনেক দিন আগের কথা। সেকালে সম্রাটরা ভারত শাসন করছেন। বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রাম। এই গ্রামে দত্তদের বাস। সম্ভবত দত্তরা গ্রামের জমিদার। সুখে শান্তিতে তাঁদের দিন কাটে।

মোগলদের পরে এল ইংরেজ। ভারতের রাজনৈতিক পট গেল পাল্টে। সঙ্গে সঙ্গে ডেরেটোনার দত্ত বংশেও এল পরিবর্তন। ইংরেজরা তখন সবে কলকাতায় শহর বানিয়েছে। কালে কালে কলকাতা হলো ভারতের রাজধানী। ডেরেটোনার দত্তবাড়ীর রামনিধি দত্ত ভাগ্যান্বেষণে এলেন কলিকাতায়। সঙ্গে ছেলে জীবন আর নীতি রামসুন্দর। তাঁরা কলিকাতায়। সঙ্গে ছেলে রামজীবন আর নাতি রামসুন্দর। তাঁরা কলকাতায় গোবিন্দপুরে এসে বাড়ি করলেন। ইংরেজরা যখন গোবিন্দপুরে কেল্লা বানালেন তখন দত্তরা চলে এলেন উত্তর কলকাতার সিমুলিয়াতে। মধুরায়ের গলিতে বাড়ি করলেন। রামনিধি ও রামজীবন বড় চাকুরি করতেন। রামসুন্দর এক জমিদারের দেওয়ান ছিলেন।

রামসুন্দরের পাঁচছেলে। বড় ছেলে রামমোহন সুপ্রীম কোর্টের এক ইংরেজ এটর্নির ম্যানেজিং ক্লার্ক ছিলেন। রামমোহনের প্রচুর আয়। তিনি ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে বিরাট নতুন বাড়ি করলেন।

রামমোহনের দুই ছেলে দুর্গাপ্রসাদ আর কালীপ্রসাদ এবং সাত মেয়ে। দুর্গাপ্রসাদ সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় বড় পণ্ডিত। তিনি দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের মেয়ে শ্যামাসুন্দরী দেবীকে বিয়ে করেন। শ্যামাসুন্দরী খুব বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি 'গঙ্গাতরঙ্গিণী' নামে এক খানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। দুর্গা

প্রসাদের ছেলে বিশ্বনাথ দত্ত। বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বাবা। খুব সম্ভব ১৮৩৫ সালে তাঁর জন্ম।

বিশ্বনাথের তখন ছ-মাস বয়স। অন্নপ্রাশনের সময়। দুর্গাপ্রসাদের তখন কুড়ি-বাইশ বছর বয়স। হঠাৎ কি হলো দুর্গাপ্রসাদ বিবাদী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। শিশু বিশ্বনাথের লালন-পালনের ভার কালীপ্রসাদ নিলেন। বছর কয়েক হলো দুর্গাপ্রসাদ সন্নাসী হয়ে চলে গেছেন। এই সময়ে বাড়ির সকলে যাচ্ছেন কালীধামে। তখনো রেলগাড়ি হয় নি, তাই গঙ্গাপথে নৌকা করে চলেছেন। হঠাৎ ছোট বিশ্বনাথ নৌকা থেকে জলে পড়ে গেলেন। মা শ্যামাসুন্দরী মুহূর্তমাত্র দেরী না করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বনাথের হাত শক্ত করে ধরে ফেলেন। কিন্তু তিনি স াঁতার জানেন না। কবিরাজ উমাপদ গুপ্ত ছিলেন নৌকায়। তিনি এই ঘোর বিপদে গঙ্গায় ঝাপিয়ে পড়ে শ্যামাসুন্দরীর চুল ধরে টেনে তুললেন নৌকায়।

এই কাশীধামেই হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শ্যামাসুন্দরীর। চিনতে পেরে দুর্গাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। এর পরে আর কোনদিন তাঁকে দেখা পাওয়া যায় নি। বড় হয়ে বিশ্বনাথ বাবার খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পান নি।

কাকার সংসারে বিশ্বনাথ কোন দিন আদর-যত্ন পান নি। তখন তাঁর বয়স সবে বার বছর। হতভাগ্য বিশ্বনাথ স্নেহময়ী মাকেও হারালেন। অনাথ বালক আরো দুঃখে, আরো কষ্টে পড়লেন।

বিশ্বনাথের বয়স এখন ষোল বছর। তিনি শিমুলিয়ার নন্দলাল বসুর দশ বছরের একমাত্র মেয়ে ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করলেন। বিশ্বনাথ গৌরমোহন আঢ্যের (পরবর্তী কালের ওরিয়েন্টাল

সেমিনারী) বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। পরে তিনি ইংরেজি, বাংলা, পারসি, আরবি, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি 'সুলোচনা' ও 'শিষ্টাচার পদ্ধতি' নামে দুখানা বই লেখেন। ১৮৬৬ সালে তিনি এটর্নি পরীক্ষায় পাশ করে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। প্রচুর আয়। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি প্রতিপত্তিও। কাজের জন্য তাঁকে ভারতের নানা জায়গায় যেতে হত। লক্ষ্ণৌ, লাহোর, দিল্লী, রাজপুতানা, বিলাসপুর, রায়পুর প্রভৃতি অনেক জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হত।

বিশ্বনাথের যেমন আয় তেমনি ব্যয়। তাঁর ছিল দয়ার শরীর। তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ। দু-হাতে দান করতেন। পাত্র-অপাত্র বিচার করতেন না। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে এই অবধি নির্বিচার দানের জন্য অনুযোগ করলে তিনি বলেন, "জীবন যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তার লাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।" এমনি ছিলেন বিশ্বনাথ। তিনি ছিলেন মানুষের মত মানুষ।

একবার নরেন্দ্রনাথ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মাকে দু-একটা কটু কথা বলেন। বিশ্বনাথ দত্ত কিছু বললেন না। তাঁর শাসন পদ্ধতি ছিল বড় সুন্দর। নরেন্দ্রনাথ যে ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন সেই ঘরের দরজায় কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখলেন—"নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে এই সকল কটু কথা বলিয়াছেন।" নরেন্দ্রনাথ ভীষণ লজ্জা পেলেন।

একবার নরেন্দ্রনাথ বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'সংসারে কেমনভাবে চলা উচিত?' বাবা বললেন, 'কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিও না।' নরেন্দ্রনাথ আজীবন একথা মনে রেখেছিলেন।

তাই পরবর্তীকালে তিনি রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটীরে সমান ভাবে চলতে পেরেছিলেন।

যেমন বাবা তেমনি ছিলেন মা। মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন নানা গুণের আধার। তিনি ভক্তিমতী, বুদ্ধিমতী, সকলের সঙ্গে কী মিষ্টি ব্যবহার। কিন্তু তাঁর মনে বড় দুঃখ। বহুদিন পর্যন্ত ছেলের মুখ দেখেন নি। প্রথম সন্তান ছেলে ও দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে খুব অল্প বয়সেই মারা যায়। এর পর তিনটি মেয়ে। তাই মায়ের মনে শান্তি নেই। পুত্রের কামনায় একমনে মহাদেবের পূজো করেন। শুধু বাড়িতেই আকুল হয়ে প্রাণের ঠাকুরকে ডেকে সন্তুষ্ট নন। কাশীধামে এক আত্মীয়াকে দিয়ে বীরেশ্বর শিবের মন্দিরে নিত্য পূজা-ভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনি করে দিন যায়। একদিন ভুবনেশ্বরী দেবী সারাদিন পূজা-সেবা করে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর সামনে উপস্থিত। ভুবনেশ্বরী বিস্মিত, অভিভূত। ক্রমে দেখলেন দেবাদিদেব ছোট্ট ছেলের রূপ ধরলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এ কী শুধু স্বপ্ন? স্বপ্ন কি সত্য হয় না? ভুবনেশ্বরী দেবীর স্বপ্ন বিফল হয় নি।

এর কয়েক মাস পরের কথা। সেদিন সোমবার, ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩ সাল। পৌষ-সংক্রান্তি। এই পুণ্যদিনের ভোরে সকলে মনের আনন্দে চলেছে গঙ্গাস্নানে। আনন্দে উৎসবে সকলে মত্ত। এই পবিত্র দিনে সূর্য ওঠার দু মিনিট আগে ভুবনেশ্বরীর কোল আলো করে আবির্ভূত হলেন এক দেবশিশু। কে জানত এই শিশু একদিন বিশ্ব বিজয় করবে, আর কেই বা জানত এই শিশু হবে নব ভারতের রূপকার?

নবজাত শিশুটি দেখতে ঠিক ঠাকুর্দা দুর্গাপ্রসাদের মত।

দুর্গাপ্রসাদের এক বোন মন্তব্য করলো—'এ যে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ। মায়া কাটাতে পারে নি তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে।' ছেলের নাম রাখা হোক দুর্গাপ্রসাদ, কেউ কেউ বললেন। মা ভুবনেশ্বরী কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—'নাম? এর নাম বীরেশ্বর।' মা জানেন বীরেশ্বর শিবের বরে এ শিশুকে তিনি পেয়েছেন। এ নামে কারো আপত্তি নেই। সকলে ডাকে বীরেশ্বর—তা থেকে বিলে। বিলে তো ডাক নাম। তাই অন্নপ্রাশনের সময় নাম রাখা হলো নরেন্দ্র, নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটিই তো তার উপযুক্ত নাম! ভাল নাম হ'লো বটে নরেন্দ্র। কিন্তু ডাক নাম থেকে গেল ঐ বিলে। আর ঠাকুর বলেন, 'নরেন'।

মায়ের ধারণা বীরেশ্বর শিবই এসেছেন তাঁর ঘরে। শিব নয় কি? যা দুরন্ত ছেলে! ঘরে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে। বয়স তো মাত্র তিন বছর হল। কিন্তু তার অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ। এটা ভাঙ্গে, ওটা ফেলে—সব তছনছ করে ছাড়ে। কত বকুনি, ভয় দেখান—কিছুতেই কিছু হয় না। মা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটা ভূত।'

কি করে ঠাণ্ডা করা যায় এই দুরন্ত ছেলেকে? মা একটা উপায় বার করলেন। কি করে যেন তার মাথায় এল। মাথায় হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিতেন আর মনে মনে 'শিব শিব' জপ করতেন। আর আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে শান্ত। যেন একেবারে ভোলানাথ শিব। মা ভয় দেখান, 'যদি দুষ্টুমি করিস, তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না!'

দাতা বিশ্বনাথ দত্ত। তাই প্রায়ই সাধু-সন্ত আসে ভিক্ষা করতে। তাদের দেখে বিলে ভারি খুশী। একদিন নতুন কাপড় পরে বিলে

খেলছে বন্ধুদের সঙ্গে। এমন সময় 'নারায়ণ হরি, নারায়ণ হরি' বলে এক সন্ন্যাসী হাজির। সন্ন্যাসী একটা কাপড় চাইলেন। বিলে সঙ্গে সঙ্গে পরণের ছোট্ট কাপড়খানা দিয়ে দিল। ছোট্ট কাপড়! সন্ন্যাসী মাথায় পাগড়ি করে বেঁধে বিলেকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

এ এক নতুন বিপদ। সাধু-সন্ত প্রায়ই আসেন। বিলে কিছু না কিছু প্রায় দিয়ে দেয়। মা তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন। তা মা বন্ধ করে রাখুন। ঘরের জানালা তো খোলা আছে। খোলা জানালা দিয়ে দেয় জামা-কাপড়, থালা-গেলাস।

দিদিদের সঙ্গে মোটেই বনত না নরেনের। যখন তখন তাদের বিরক্ত করত, অতিষ্ঠ করে তুলত। ধরতে গেলে নরেন আস্তাকুঁড়ে গিয়ে দাঁড়াত। কোনো বিচার নেই, ঘেন্না নেই। বলত—আয় ধর্‌না ধর্‌না।

বাড়ীতে কত পোষা জন্তু-জানোয়ার। বানর, ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, খরগোশ, বিলিতি ইঁদুর, দুধেল গাই। যত ভাব তার এদের সঙ্গে। বড় ভালবাসে নরেন এদের। এরাই তার খেলার সাথী। আর তার বাবার গাড়ি চালায় যে কোচোয়ান তার সঙ্গে। মাথায় পাগড়ি, হাতে চাবুক। গাড়ির সামনে উঁচু আসনে বসে। চাবুক ঘোরায় আর শহরময় ঘোড়া ছোটায়। নরেনের বড় লোভ হয়। সেও অমনি বেগবান ঘোড়া ছোটাবে!

একদিন গাড়ি করে বাবা-মা বেড়াতে বার হয়েছেন শহরে। নরেন মায়ের কোলে। হঠাৎ বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে?' সঙ্গে সঙ্গে বিলের উত্তর 'সহিস না হয় কোচোয়ান হব।'

ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে বসে রামায়ণের কত গল্প শোনে।

পরে মায়ের কাছে রামায়ণ পড়ে। রাম-সীতাকে তার খুব ভাল লাগে। বাজার থেকে মাটির একজোড়া রাম-সীতার মূর্তি কিনে আনে। দোতালায় ছাদের চিলে ঘরে নিরালায় পূজো করে।

শুধু কোচোয়ান নয়, বাড়ির সইসের সঙ্গে ও তার খুব ভাব, কত গল্প তার সঙ্গে। সহিস যেন সব জান্তা। কিন্তু তার বড় কষ্ট! বিয়ে করে সে মোটেই সুখী হয় নি। তাই সে বলতো বিয়ে করা বড় খারাপ। বিয়ে থেকে সংসার। আর সংসার থেকে যত দুঃখ যত ঝামেলা। অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সইস। নরেনের শিশুমনে আলোড়ন ওঠে। সেও প্রতিজ্ঞা করে, না, বিয়ে সে করবে না। সইস তার মন খাঁটি করে দিয়েছে। কিন্তু তার রাম সীতার কি হবে। রাম-সীতা যে বিবাহিত! মহা সমস্যায় পড়ে বিলে। তার প্রিয় রাম-সীতাকে বিদায় দিতে হবে। তার চোখে জল এসে যায়। ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে। মা আদর করে কোলে বসিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। বলেন, 'ওতে আর কি হয়েছে? তুই শিব পূজো কর।'

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু রাম-সীতার মূর্তি বিদায় করা সহজ কাজ নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের ঘরে রাম-সীতার মূতির দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে। ধীরে ধীরে মূর্তি পাশের রাস্তায় ফেলে দেয়। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরদিন বাজার থেকে শিবমূর্তি আনে। বসায় রাম সীতার আসনে।

নরেনের বড় সাধ সন্ন্যাসী হওয়ার। একদিন একখণ্ড গেরুয়া কাপড় জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরেন। 'এ কি রে?' মা জিজ্ঞেস করেন।

'আমি শিব হয়েছি।'—চটপট উত্তর বিলের। শিবের ধ্যানে

বসে বিলে। ধ্যান করলেই তো মাথায় জটা গজায়। আর সেই জটা গাছের শেকড়ের মত মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। বিলে মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখে কত বড় জটা হলো, মাটিতে ঢুক্‌ছে কি না। বিলে হতাশ হয়। মাকে বলে—'মা এত ধ্যান করছি, জটা বার হচ্ছে না কেন ?' মা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'এত শীঘ্র কি হয় ? এক আধ ঘণ্টায় বা এক আধ দিনে হয় না, অনেক দিন লাগে।'

ধ্যান ধ্যান খেলা ছোট্ট বিলের খুব প্রিয়। কখনো একা, কখনো বা বন্ধুদের নিয়ে ধ্যানে বসে। কখনো কখনো বিলে ধ্যানে তন্ময় হয়ে যায়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সাড়া পাওয়া যায় না। একদিন এমনি ভাবে সকলে ধ্যানে বসেছে। হঠাৎ এক বন্ধু চোখ খুলে দেখে মেঝেতে বড় একটি গোখরো সাপ। সাপ, সাপ বলে চীৎকার করে উঠল। আর আর বন্ধুদের ধ্যান ভেঙে গেল। নরেন কিন্তু গভীর ধ্যানে মগ্ন, সাড়া শব্দ নেই। সাথীরা ছুটে পালাল। নরেনের মা-বাবাকে সংবাদ দিল। তাঁরা এসে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখে নির্বাক হয়ে গেলেন। বিলে ধ্যান-মগ্ন। সামনে বিরাট সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। বাবা মা ভয়ে কাঠ। কিন্তু হঠাৎ-ই সাপ নিজেই সরে গেল। কোথায় গেল খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে ধ্যান ভাঙলে বিলে বললো—'আমি তো কিছুই টের পাই নি।'

নরেনের ঘুম ছিল অদ্ভুত। চোখ বুজলেই তার ঘুম আসত না। চোখ বুজলেই দুই-ভুরুর মধ্যে এক আলোর বিন্দু ফুটে ওঠে। সেই বিন্দু ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ফেটে পড়ে। এক আলোর বন্যা বয়ে যায় যেন। সেই আলোর সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে তার ঘুম আসে। প্রতি রাত্রে এরকম হয়। নরেন্দ্র মনে করে এটাই স্বাভাবিক। সকলেরই মনে হয় এরকম হয়।

'রাজা-উজির' খেলা ছিল নরেন্দ্র নাথের আর একটি প্রিয় খেলা।

ঠাকুর-দালানের ছটি ধাপ। সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটি সিংহাসন। সেই সিংহাসনে রাজা হয়ে বসার অধিকার একমাত্র বিলের তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিচের ধাপে বসবে মন্ত্রী, সেনাপতি, সবার নীচে বসবে রাজ সভার অন্যান্যরা। সিংহাসনে বসে রাজা বিলের প্রশ্ন—'মন্ত্রী রাজ্যের খবর কি?' মন্ত্রী কখনো বলে—'আজ্ঞে, প্রজারা খুব সুখে আছে।' কখনো বলে, 'না মহারাজ, এক দস্যু বড় উৎপাত করছে।' 'সেই দস্যুর মাথা কেটে ফেল' সঙ্গে সঙ্গে মহারাজার আদেশ পালনের জন্য ছুটোছুটি পড়ে যেত।

আরো নানা রকমের খেলা ছিল নরেনের। তখন কলকাতায় সবে গ্যাসের আলো, সোডা-লেমনেড এসেছে। নরেন ও অমনি নানা কলকব্‌জা যোগাড় করে গ্যাসের আলো বানালো, লেমনেডের দোকান বানালো। এমন কি রেলগাড়ীও চালাল। গ্যাসঘর বানালো।

ছ বছর বয়স বিলের। বাবা তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। কোরা ধুতি পরে, কোমরে খাগের কলম ঝুলিয়ে বগলে মাদুর নিয়ে বিলে গেল পাঠশালায়। কিন্তু কদিন পরে বাবা দেখলেন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বিলে বেশ কটি খারাপ কথা শিখে ফেলেছে। বাবা তাকে পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে বাড়ীতেই গুরুমশায় রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। নরেন্দ্রনাথের পড়ার ব্যাপারও ছিল অদ্ভুত। গুরুমশায় পড়ে যেতেন আর বিলে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে শুনতো। এতেই তার পড়া হয়ে যেত। রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে—এক আত্মীয়ের মুখে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শুনে শিখে ফেলে।

বিলে প্রায়ই শোনে জাত যাবে, জাত গেল। জাত কোথায় যায়, কি ভাবে যায় সে ভেবে পায় না। বাবার বৈঠক খানায় নানা জাতের মক্কেল আসে। তাদের জন্য পৃথক পৃথক হুঁকো। কোনটা বামুনের, কোনটা শূদ্রদের, কোনটা মুসলমানের। বিলের বড় কৌতূহল

হলো। কি করে জাত যায়—দেখতে হবে। এক ফাঁকে বাবার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে পড়ল। একে একে সব হুঁকোয় টান দেয় ভুড়ুক ভুড়ুক। কিন্তু কই, তার তো কিছু হল না। সে তো সেই আগের বিলেই আছে। কোন পরিবর্তন হয় নি তো। আকাশ ভেঙে পড়ল না তো। সে তো মরে গেল না। তা হলে?

ওকি হচ্ছে রে বিলে? বাবা কখন ঘরে ঢুকে পড়েছেন। দেখছি জাত যায় কি না; বিলের উত্তর অম্লানবদনে। শুনে বাবা বিশ্বনাথ তো থ। এই বিরাট সমস্যার কি সহজ সমাধান।

নরেনের বয়স সাত বছর। বাবা তাকে বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তার খুব একটা মন নেই। গল্পগুজব, হি-হুল্লোড় নিয়েই সদা ব্যস্ত। ছেলেদের মধ্যে বিলেই নেতা। ঝগড়া থামানো নতুন নতুন খেলার কথা ভাবা সবই তার দায়িত্ব।

একদিন মাস্টার মশায় ক্লাশে পড়াচ্ছেন। বিলে তার পাশের ছেলেদের সঙ্গে গল্পে মত্ত। মাস্টায় মশায় বিরক্ত হলেন। হঠাৎ পড়া জিজ্ঞেস করলেন। সবাই চুপ। কেউ- উত্তর দিতে পারল না। শাস্তি – দাঁড়াও বেঞ্চির উপর। এবার নরেনের পালা। কিন্তু আশ্চর্য। নরেন কিন্তু সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিল। মাস্টার মশায় তো অবাক। শাস্তি আর তাকে দেওয়া গেল না। কিন্তু নরেন নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াল বেঞ্চিতে। আমিও গল্প করেছি কেবল ওরাই গল্প করে নি। সুতরাং আমিও দাঁড়াব বেঞ্চিতে। বন্ধুদের সঙ্গে তার এমনি ভালবাসা।

আর একজন শিক্ষক। ভীষণ কড়া, ভয়ানক রাগী। একবার কি মনে করে বিলে হেসে ফেলেছে। আর যায় কোথায়। শিক্ষক তো অগ্নিশর্মা। বিলের ওপর চলল এক নাগাড়ে চড় চাপড়। মাস্টার

মশায় এতেই সন্তুষ্ট নয়। কান এমন জোরে টান দিলেন যে কান ছিড়ে রক্ত পড়তে লাগল। বিলেও রুখে দাঁড়াল। গোলমাল শুনে বিদ্যাসাগর নিজেই ছুটে এলেন। না, এ স্কুলে আর পড়বে না সে। বিদ্যাসাগরকে সব কথা বলে বই-খাতা নিয়ে সোজা বাড়ি। মা ছেলের দশা দেখে শিউরে উঠলেন। না, তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না। কিন্তু পর দিন বিলে যথারীতি স্কুলে গেল। আগের দিনের সব কথা ভুলে গেছে। অবশ্য বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে মার-ধোর তুলে দিলেন।

নরেনের বয়স তখন ছ বছর। এক বন্ধুকে নিয়ে গেছে চড়ক দেখতে। চড়কতলা থেকে মাটির মহাদেব কিনে ফিরছে। অন্ধকার হয়ে গেছে—বন্ধুটি একটু পিছিয়ে পড়েছে। এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ি খুব জোরে আসছে। বিলে পিছন ফিরে দেখে বন্ধুটি ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে পড়ে। লোকজন চীৎকার করে উঠল—'গেল গেল,' নরেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ে বন্ধুকে হাত ধরে টেনে আনল। বিপদ কেটে গেল। এক লহমায় সব ঘটে গেল। সকলে বাহবা দিতে লাগল। মা সব কথা শুনে বললেন—'বাবা, এই তো মানুষের মত কাজ! সব সময়ই এই রকম মানুষ হবার চেষ্টা করবি।'

নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের যে কত ভালবাসত তা বলে শেষ করা যায় না। একবার কুড়ি-পঁচিশজন ছেলের সঙ্গে হৈ হৈ করে চলেছে গড়ের মাঠের কেল্লা দেখতে। পথে এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু বন্ধুরা তা বিশ্বাস না করে হাসি ঠাট্টা করতে করতে এগিয়ে গেল, নরেন্দ্রনাথ তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে প্রচণ্ড জ্বর। থর থর করে কাঁপছে। নরেন্দ্রনাথ গাড়ি ডেকে তাকে নিজেই বাড়ি পৌঁছে দিল।

নরেন্দ্রনাথের সাহস ও বন্ধুদের প্রতি ভালবাসার আরো অনেক কাহিনী আছে। একবার নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের নিয়ে চাঁদপাল ঘাট

থেকে নৌকা করে মেটিয়াবুরুজে গেল নবাব ওয়াজেদ আলি শার চিড়িয়াখানা দেখতে। ফেরার পথে এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ল। নৌকায় বমি করে ফেলল। মাঝিরা বিরক্ত। পরিষ্কার করে দিতে বলে। ছেলেরা আরো বেশি ভাড়া দেবে—অন্যকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিতে বলল। কিন্তু মাঝিরা নাছোড়বান্দা। মারামারি বাধার উপক্রম। এক ফাঁকে সকলের ছোট নরেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে তীরে উঠল। বন্ধুদের কি করে উদ্ধার করা যায় ভাবছে। এমন সময় দেখল দু'জন গোরা সৈন্য আসছে। নির্ভীক, সাহসী নরেন্দ্রনাথ গোরা সৈন্যের কাছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাদের বিপদের কথা জানাল। গোরা সৈন্য দুটি কোনরকমে বুঝতে পারল তাদের বিপদের কথা। নরেন তাদের হাত ধরে নৌকার কাছে নিয়ে গেল। গোরা সৈন্য দেখে মাঝিরা ভয়ে কেঁচো। একে তো ইংরেজ, তায় আবার সৈন্য। ওরে বাবা! এক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি বাছারা। তাড়াতাড়ি তাদের ছেড়ে দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল মাঝিরা। মুহূর্তের মধ্যে যেন ভোজবাজি ঘটে গেল। ছোট্ট ছেলে নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে গোরা সৈন্যরা খুব খুশী। তারা তাকে থিয়েটার দেখাতে চাইল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের বিদায় জানাল। বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে এল।

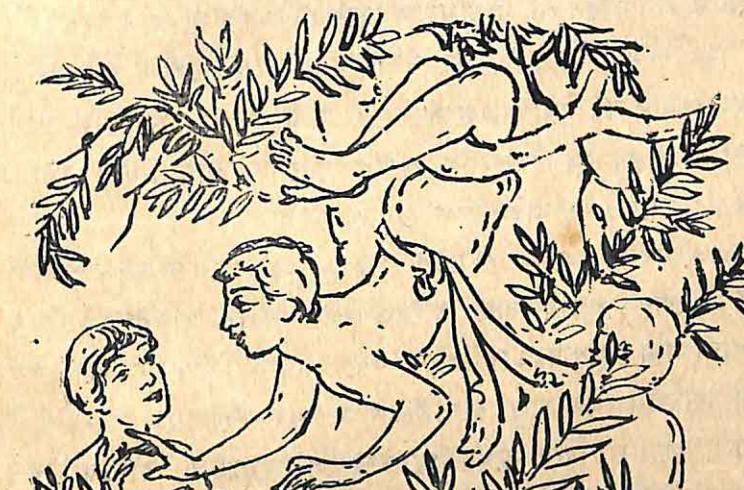
নরেন্দ্রনাথের বয়স দশ বছর। ইংলণ্ড থেকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণে এসেছেন। সেই বছর বিলেত থেকে গঙ্গার ঘাটে 'সিরাপিস' নামে একটি বড় যুদ্ধ জাহাজ এসেছে। অনেকে জাহাজ দেখতে যাচ্ছে। বন্ধুরা নরেন্দ্রনাথকে ধরে বসল জাহাজ দেখতে যাবে। ছাড়পত্র লাগবে যে। চৌরঙ্গীর অপিসে বড় সাহেবের কাছ থেকে নিতে হবে। নরেন্দ্রনাথ তো নিজে হাতে এক দরখাস্ত লিখল। কিন্তু সিঁড়িতে উঠতেই বাধা। দারোয়ান ঢুকতে দেবে

না। অতটুকু পুঁচকে ছেলে। তার সাহস তো কম নয়! কিন্তু নরেন্দ্রনাথ হার মানবার পাত্র নয়। পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সটান উঠে গেল তে-তলায়। ভিড়ের মধ্যে মিশে হাজির হলো বড় সাহেবের ঘরে। মাথা নিচু করে সাহেব অনুমতি পত্রে সই করে চলেছেন। এক সময়ে নরেন্দ্রনাথের আবেদন পত্রেও সই দিলেন সাহেব। বুক ফুলিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে নরেন্দ্র।

'তুম্ ক্যায়সা উপর গয়া থা?' হিন্দুস্থানী দারোয়ান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হাম জাদু জানতা।'—নরেন্দ্রনাথ মনের আনন্দে বন্ধুদের নিয়ে জাহাজ দেখে এল।

পাড়ায় বিলের এক সহপাঠীর বাড়িতে একটি চাঁপাফুলের গাছ।



বিলে চাঁপা গাছের ডালে দোল খাচ্ছে

তার ডালে বিলে প্রায়ই দোল খায়। বসে বসে নয়, ডালে পা

বাধিয়ে মাথা নিচু করে। যদি পড়ে যায়? হাত-পা ভাঙবে। বন্ধুর ঠাকুরর্দা রামতনু বসু অনেক বলে-কয়ে নেমে আসতে বললেন। বিলে নেমে এল। কিন্তু মনে সন্দেহ। 'কেন ও গাছটায় চড়লে কি হয়?'

কি বলা যায়—বৃদ্ধ ভাবছেন। ভেবে বললেন—

'ও গাছে একটা বেহ্মদত্তি আছে। কী ভয়ংকর তার চেহারা! যারা গাছে চড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেয়।'

ভয়ের কথা বটে। কিন্তু বিলে অত সহজে ভয় পাবার ছেলে নয়। সে ঠাকুরর্দার কথা বিশ্বাসই করল না। ঠাকুরদা চলে গেলে আবার সে গাছে চড়তে গেল। মনে মনে ইচ্ছে ভূত-বাবাজীর সঙ্গে একবার দেখা হলে হয়। গায়ে থুথু দিয়ে জব্দ করবে। 'না ভাই অমন কাজটি করিস নে, ঘাড় মটকে দেবে।'—সাথী সাবধান করে।

'তুই যেমন গাধা!' নরেন জোরে হেসে বলে, 'কেউ কিছু বললে অমনি তা বিশ্বাস করতে হবে? যদি তোর ঠাকুরর্দার কথা সত্যি হয়—তা বলে বেহ্মদত্তি অনেক আগেই আমার ঘাড় মটকে দিত।' বিলের কী সাহস ও যুক্তিবাদী মন!

একঘেয়েমি বিলের মোটেই পছন্দ নয়। নিত্য নতুন আনন্দ চাই। লেখা পড়ার সঙ্গে গানেও তার সমান আকর্ষণ। কোন ভিখারী গান গেয়ে দরজায় ভিক্ষা করতে এলে বিলে মন দিয়ে সেই গান শোনে। কোথাও রামায়ণ গান হলে—সেখানে মনোযোগী শ্রোতা বিলে। বিলে সখের থিয়েটার দল গড়েছে। বাড়ির ঠাকুর দালানে স্টেজ। অভিনয়ও করলো কয়েকবার। কিন্তু বাদ সাধলো তার এক কাকা। বাড়িতে স্টেজ করা বা থিয়েটার করা চলবে না। যাক্ গে স্টেজ, এবার বাড়ির উঠোনের এক পাশে বিলে ব্যায়ামের আখড়া খুলে বসল। বন্ধুরা সেখানে নিয়মিত ব্যায়াম করে। কিন্তু

একদিন হল কি। একদিন তার খুড়তুতো ভাই হাত ভেঙে ফেলল ব্যায়াম করতে গিয়ে। অমনি ঐ কাকা এসে দিলেন ভেঙে ব্যায়ামের আখড়া। দূর করে দিলেন সব সাজ-সরঞ্জাম। কি আর করা। অগত্যা বিলে দলবল নিয়ে প্রতিবেশী নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় নাম লেখালো। এখানেই নরেন্দ্রনাথ শিখলো লাঠিখেলা, অসি-চালনা, নৌকা চালনা, কুস্তি, সাঁতার, একবার তো ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম পুরস্কার পেল নরেন্দ্রনাথ—রূপোর প্রজাপতি। কিন্তু ঐ ব্যায়ামাগারেই একদিন ঘটল এক বিপদ। সকলে মিলে একটা ভারি ট্রাপিজ খাটাতে ব্যস্ত। কিন্তু এত ভারি যে ছেলেরা পারছে না। চারদিকে লোক জমে গেছে। মজা দেখছে সবাই। কিন্তু সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। নরেন্দ্রনাথ দেখলো ভিড়ের মধ্যে এক ইংরেজ নাবিক। নরেন্দ্রের অনুরোধে নাবিকটি এগিয়ে এল সাহায্যের জন্য। কিন্তু হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে গেল। কাঠের খুঁটি পড়বি তো পড় সাহেবের মাথায়! সাহেবের কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। একে তো সাহেব, তায় আবার থানা-পুলিশের ঝামেলা। পালা, পালা। নরেনের সব বন্ধু ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু নরেন অচঞ্চল, সঙ্গে আর দু একজন বন্ধু। আহতকে ফেলে নিজেকে নিরাপদ করা কাপুরুষের কাজ। নরেন নিজের কাপড় ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। মুখে-চোখে জল দিতে লাগল, বাতাস করতে লাগল। সাহেব জ্ঞান হারিয়েছিল। এতক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে। কাছেই একটা স্কুল ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার ডাকল। নবগোপাল মিত্রকে খবর দিল। সাত দিন লাগলো ভাল হতে। সাত দিন ধরে এক নাগাড়ে সেবা করে সাহেবকে সুস্থ করে তুলল। নরেন এর মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা সাহেবের হাতে দিল। সাহেব খুব খুশী হয়ে বিদায় নিল। মানুষের সেবাই তো ঈশ্বরের সেবা—এই শিক্ষাই তো বড় হয়ে নরেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন!

মায়ের সঙ্গে মধ্য প্রদেশের রায়পুরে চলেছে বিলে। ১৮৭৭ সাল। বয়স তখন তার চৌদ্দ বছর। মেট্রোপলিটান স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর (আজকালের অষ্টমশ্রেণী) ছাত্র। বিলের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত তখন রায়পুরে ছিলেন। এলাহাবাদ-জব্বলপুর হয়ে নাগপুর পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়া যায়। নাগপুর থেকে রায়পুর গোরুর গাড়িতে যেতে হত। রেলগাড়ী ছিল না। দীর্ঘপথ। প্রায় পনের দিন লাগে গোরুর গাড়িতে। চলেছে গোরুর গাড়ি। পথের দুধারে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য! ঘন সবুজ বন। রঙ বেরঙের ফুল। পাখীর কাকলী। বুনো জন্তু-জানোয়ারের নির্ভয়ে ঘোরা-ফেরা। মাঝে মাঝে উঁচু-উঁচু পাহাড়। কল কল শব্দে প্রবাহিত নদী! এ সব মন মাতানো ছবি দেখতে দেখতে নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। কে এই সুন্দরের স্রষ্টা! নরেন্দ্রনাথ সেই অরূপ সুন্দরের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল প্রকাণ্ড এক মৌচাক। পাহাড়ের বিরাট ফাটলের গা জুড়ে এই মৌচাক। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত, পুলকিত এই মৌ-মাছিদের কথা ভেবে। ক্রমে ক্রমে তন্ময়তা। পরে বাহ্যজ্ঞান লোপ। যখন জ্ঞান ফিরে এল—তখন অনেক দূর চলে এসেছে। সেই গাড়িতে নরেন্দ্রনাথ একা ছিল—তাই অন্যেরা জানতে পারে নি।

তখন রায়পুরে কোন ভাল স্কুল ছিল না। বাবাই তাকে পড়াতে লাগলেন। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ তাকে কোন মামুলি শিক্ষা দিতেন না। তিনি তাঁর মতামত চাপিয়ে দিতেন না। স্বাধীন ভাবে যাতে নরেন শিক্ষা নিতে পারে সেই রকম ভাবে পড়াতেন। এ ছাড়া বিশ্বনাথের বাসায় বহু জ্ঞানী, পণ্ডিত লোকের সংস্পর্শে এসেছিল নরেন।

দেড় বছর রায়পুরে থাকার পর বিশ্বনাথ দত্ত সকলকে নিয়ে কলকাতা ফিরে এলেন। নরেনের শরীর স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়েছে,

হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা হয়েছে। প্রায় দু বছর অনুপস্থিত, তাই বিশেষ অনুমতি নিয়ে স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি হল। সময় অল্প। সে মন দিয়ে পড়তে লাগল। তিন বছরের পড়া এক বছরে শেষ করতে হবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার আর মাত্র দু দিন বাকি। জ্যামিতির কিছুই পড়া হয় নি। নরেন্দ্রনাথ সারা রাত জেগে পড়তে লাগল আর—চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জ্যামিতির চারখণ্ড বই পড়ে শিখে ফেলল। ১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল বিলে। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে একমাত্র নরেনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হল। বয়স তখন ষোল। বাবা খুশী হয়ে তাকে একটি রূপোর ঘড়ি উপহার দিলেন।

মেট্রোপলিটান স্কুলের এক শিক্ষকের বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হবে। সভাপতি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে কে বলবে! কারো সাহসে কুলাল না। সকলে ধরে বসল নরেনকে। অত বড় বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের সামনে বক্তৃতা! কি আর করা যাবে! নরেন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেল। বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দাঁড়াল নরেন। পাক্কা আধঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিল ইংরেজিতে। ভারি সুন্দর হল সে ভাষণ, স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেন।

১৮৮০ সালে নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. ক্লাশে ভর্তি হলেন। কিন্তু প্রথম বর্ষের শেষে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়লেন। কলেজে আসতে পারেন না। অবশেষে বাড়ির কাছে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) ভর্তি হলেন। এই কলেজে তখন পড়তেন বিখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হলেন।

নরেন্দ্রনাথ যৌবনে পা দিলেন। নরেনের মনের মধ্যেও এলো

বিরাট পরিবর্তন। যৌবনে পা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই প্রতি রাত্রিতেই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন। তিনি দেখতেন যেন তাঁর সামনে দু রকম জীবন। কখনো দেখতেন তাঁর অনেক টাকা পয়সা, বিরাট বড়লোক—কত নাম, যশ, খ্যাতি। তাঁর মত আর কেউ নেই। তার পরক্ষণেই আবার দেখতেন, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কৌপীনমাত্র সম্বল। এই দুই জীবনের মধ্যে সন্ন্যাস জীবনই যেন তাঁর বেশি পছন্দ। শুধু স্বপ্নে দেখা যায়। সত্যি সত্যি যৌবন শুরু থেকেই ধর্মে তাঁর খুব আগ্রহ দেখা গেল। নিরামিষ খান, মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শয়ন করেন। এই সময় থেকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছেন। তিনি ধ্যান করতে বলেন। নানা উপদেশ দেন। নরেন্দ্রনাথ যখন প্রবেশিকা পড়েন তখন থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাঁর যাতায়াত। নরেন্দ্রনাথ বরাবরই সঙ্গীতপ্রিয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র। বিখ্যাত গায়ক যদুভট্ট ঠাকুর বাড়িতে আসেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে একটা বিয়ের আসর বসেছে। রাজনারায়ণ বসুর এক মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিয়ে। ঐ বিয়ে উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান রচনা করে নরেন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজনকে শিখিয়ে দেন। যথা সময়ে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্রনাথ সেই তিনখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের বড়। 'দুই হৃদয়ের নদী', 'জগতের পুরোহিত তুমি', আর 'শুভদিনে এসেছ দোঁহে।'—এই তিনখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান নরেন্দ্রনাথরা। (দ্রষ্টব্য—স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত'—নলিনীকুমার ভদ্র)

নরেন্দ্রনাথের মনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ঈশ্বর বলে কি সত্যি সত্যি কেউ আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? ব্রাহ্ম-সমাজে মিশে নরেন্দ্রনাথ মনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজেন। সমাজে গান গান, প্রার্থনা করেন। তাঁর জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই।

নরেন্দ্রনাথের মন অশান্ত হয়ে উঠল। কে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবে। একদিন কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক অনুপস্থিত। অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি সাহেব ক্লাশে গেলেন। পাঠ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা। কবিতাটির নাম 'একস্কার্শন'। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সৌন্দর্যে এমনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন যে তিনি বাহ্যজগৎ ছেড়ে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে চলে যেতেন। ছাত্ররা ঠিক বুঝতে পারছে না। অধ্যক্ষ হেষ্টি বললেন, মন যখন খুব পবিত্র হয় এবং বিশেষ বিষয়ে একাগ্র হয় তখন ওরকম অনুভূতি হয়। তিনি বললেন, 'আমি এমন একজন মাত্র লোককে দেখিয়াছি যিনি মনের ঐ অতি শুভ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।' রামকৃষ্ণ! কে তিনি? তিনি কি পারবেন তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় না?

নরেন্দ্রনাথ তখন এফ. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। শিমুলিয়া পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ছোট্ট একটা ঘরোয়া উৎসব, একজন গায়ক দরকার। সুরেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে ডাকলেন গান গাইবার জন্য। গান শুনবেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ঠাকুর। সেই রামকৃষ্ণ ঠাকুর! নরেন্দ্রনাথ পুলকিত হলেন। ভজন গান গেয়ে শোনালেন ঠাকুরকে। গান নয় তো, যেন সুধা; সেই-ই দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ, রামকৃষ্ণ নরেনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে যেতে বলে গেলেন।

নরেন্দ্রের মনে দিন দিন অশান্তি বেড়ে চলল। একদিন তাঁর এক আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত তাঁকে বললেন 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে এদিক সেদিক না ঘুরে বরং দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে যাও।' হ্যাঁ, নরেন্দ্রনাথ একাধিক বার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কৃপা লাভ করলো। তাঁর অন্তর শান্ত হল। পরশমণির ছোঁয়া পেলেন তিনি।

১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রনাথ বি এ. পাশ করলেন। এর পর মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশানে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) বি. এল. পড়তে শুরু করেন। কিন্তু পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না। বি. এ. পাশের অল্প দিন পরেই তাঁর বাবা মারা যান। তাছাড়া তাঁর মনোরাজ্যেও বিষম ঝড় উঠেছে। বাবা মারা যাওয়ার পরে সে ঝড় আরো প্রবল হল। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করলেন। তাঁর অন্তরের ঝড় শান্ত হল। তিনি প্রকৃত পথ খুঁজে পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমুদ্রে মিলিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। বাল্যকালের দুরন্ত বিলে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনের স্পর্শে পরবর্ত্তীকালে হয়ে উঠলেন বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ॥



……ভবিষ্যতের জাতির জনক……

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকা, প্রভাস, সুদামাপুরী পশ্চিম-ভারতের এক একটি তীর্থস্থান। রাজা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বুকে বহন করছে হাজার হাজার বছর। সুদামাপুরী আরব সাগরের তীরে ছোট্ট একটি শহর। শ্রীকৃষ্ণের ছোট বেলার বন্ধু সুদামার নামে এই শহর। দ্বারকার রাজা হয়েও শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলার গরীব ব্রাহ্মণ বন্ধু সুদামাকে কোনদিন ভোলেন নি। সেই সুদামারই স্মৃতি অমর হয়ে আছে সুদামাপুরীর মধ্যে। সুদামাপুরীর অন্য নাম পোরবন্দর। এই পোরবন্দরে এক বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম নিলেন ভারতের অন্য এক রাজা ; জনগণের রাজা গান্ধী মহারাজ। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শুভ আবির্ভাব!

গুজরাটী ভাষায় 'গান্ধী' শব্দের অর্থ 'মুদী'। মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব-পুরুষ মুদীর ব্যবসা করতেন। কিন্তু মহাত্মাজীর পিতামহ থেকে পর পর তিন পুরুষ দেশীয় রাজাদের মন্ত্রীত্ব করে এসেছেন। পিতামহ উত্তমচাঁদ গান্ধী, ডাক নাম উতা গান্ধী। তিনি প্রথমে পোরবন্দরে দেওয়ান ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা, বুদ্ধিমান ও সাহসী। কোন কারণে রাজার সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় উতা গান্ধী জুনাগড় রাজ্যে আশ্রয় নেন। জুনাগড়ের নবাবের দেওয়ান হন তিনি। উতা গান্ধীর ছেলে করমচাঁদ। লোকে তাঁকে 'কাবা' গান্ধী বলে ডাকে। কাবা গান্ধীই গান্ধীজীর বাবা। মা ভক্তিমতী, সাধ্বী মেয়ে। গান্ধীজী বাবা মায়ের কাছ থেকে এ সব গুণই পান। কাবা গান্ধী ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান। পরে তিনি রাজকোটের দেওয়ান হন। রাজকোটের রাজা ছিলেন

ঠাকুরসাহেব। একবার এক ইংরেজ কর্মচারী ঠাকুরসাহেবকে অপমান করে। দেওয়ান কাবা গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। ছোট একটি দেশীয় রাজ্যের সামান্য দেওয়ান প্রতিবাদ করবে একজন সাহেবের ? আস্পর্ধা তো কম নয় ! দেওয়ানকে মাপ চাইতে হবে। কাবা গান্ধী বললেন, কখনও না। তিনি তো কোন অন্যায় করেন নি। কাবা গান্ধীকে জেলে যেতে হলো। তবুও তিনি মাপ চাইলেন না। অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ালেন না তিনি। পরে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গান্ধীজীর উপযুক্ত পিতা বটে।

মা পুতলী বাঈ-এর প্রভাব গান্ধীজীর ওপর গভীর ভাবে পড়ে। তিনি খুব ধর্মপরায়ণা ছিলেন। প্রতিদিন মন্দিরে যান। পূজো করেন। পূজাপাঠ না করে কখনো খান না। সারা বছর কত রকম ব্রত পালন করেন। চাতুর্মাস ব্রত, চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি। এই ভক্তিমতী মায়ের ছেলে গান্ধীজীর মত মাতৃভক্ত ছেলে খুব কমই দেখা যায়।

গান্ধীজীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মুদী বংশের ছেলে গান্ধী আজ ভারতবাসীর অন্তরের রাজা, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

গান্ধীজীর বাল্যকাল পোরবন্দরে কাটে। এখানকার এক পাঠশালায় তাঁর লেখাপড়া শুরু। পাঠশালায় কষ্ট করে কিছু নামতা মুখস্থ করে আর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে গুরুমশায়ের নামে ছড়া কাটা শেখে। পোরবন্দর থেকে কাবা গান্ধী চলে এলেন রাজকোটে। মোহনদাসের তখন সাত বছর বয়স। রাজকোটে এসে প্রথমে পাঠশালায়, পরে মধ্যস্কুল ও শেষে বার বছর বয়সে শহরের হাইস্কুলে পড়াশোনা করে মোহনদাস। বড় লাজুক ছেলে মোহন। কারো সঙ্গে মেশে না। নিজের পড়া নিয়েই থাকে।

ছুটি হলেই পালিয়ে আসে। পাছে কেউ ঠাট্টা করে এই তার ভয়। স্কুলে খুব ভাল ছেলে ছিল না মোহন। মাঝারি রকমের ছেলে হলেও একবার ডবল প্রমোশন পায় ; আবার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়া ছেলে বলে মোহনদাসের কোন অভিমান ছিল না। নিজের ব্যবহার সম্বন্ধে সব সময় সজাগ। নিজের ব্যবহারে কোন ত্রুটি হলে চোখে জল আসে। শিক্ষক মশায়রা যাতে না বকেন সে বিষয় সাবধান থাকে।

একবার স্কুলে ইনেস্‌পেকটার জাইল্‌স্ সাহেব এসেছেন। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই ভয়ে ভয়ে আছে। চারদিকে থম্‌থমে ভাব। হেড্‌মাষ্টার মশাই মাঝে মাঝে বারান্দা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছেন। মাষ্টার মশায়রা ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে উঠে দাঁড়াতে হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

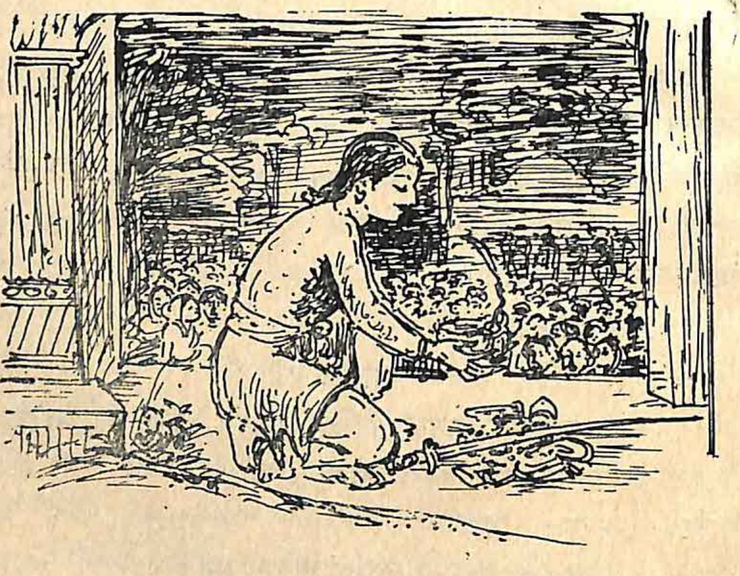
—কোন ক্লাশ ?

—চতুর্থ শ্রেণী ! এখন ইংরাজির ক্লাশ।

—বেশ, কয়েকটা বানান দিচ্ছি, লেখ। ভুল হয় না যেন। ছেলেরা মাথা নীচু করে বানানগুলো লেখে। শিক্ষক মশায় পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন। দেখলেন সকলেই বানানগুলো ঠিক মত লিখছে। কিন্তু মোহন যে 'Kettle' বানান ভুল লিখে বসে আছে। মাত্র একটা 'T' দিয়েছে। একটা ছেলের একটি মাত্র বানান ভুলের জন্য গোটা ক্লাশের বদনাম হবে। না, তা হয় না। শিক্ষক মশায় জুতোর ডগা দিয়ে ইশারা করেন—'পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকে নাও।' কিন্তু ভাল মানুষ মোহনদাস ইঙ্গিত বুঝতে পারে না। সে ভুল বানানই দেখাল। পরে শিক্ষক মশায় বললেন, 'মোহন তোমার মত বোকা ছেলে একটিও দেখি নি। এত করে ইশারা করলাম বুঝতে পারলে না ?' মোহন মাথা হেঁট করে বকুনি শুনলো।

সে ঢুকতে পারে নি। সেজন্য মোটেই দুঃখিত নয় বরং খুব আনন্দিত। ভেবে অবাক হলো, মাষ্টার মশাই মিথ্যার আশ্রয় নিতে বলেছেন বলে।

মোহনদাস স্কুলের পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই বড় একটা পড়ার সময় পায় না। একদিন দেখে বাবা এবটা বই কিনে এনেছেন। নাম 'শ্রবণের পিতৃভক্তি।' জৈন পুরাণের গল্প এটি।



রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছেন। (পৃঃ ৭৯)

কৌতূহল বশে মোহন বইটির দু-এক পৃষ্ঠা ওল্টায়। বেশ ভাল লেগে গেল গল্পটি। অন্ধ বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে শ্রবণ। খুব অল্প বয়স শ্রবণের। সাধ্যমত বাবা-মায়ের সেবা করে। সেই শ্রবণ একদিন মারা গেল। অন্ধ বাবা-মায়ের দুঃখের অন্ত নেই। মোহনের চোখে জল আসে শ্রবণের গল্প পড়ে। কিছুদিন পরে মোহন এক ছবি-দেখানো লোকের কাছে আবার শ্রবণের ছবি দেখল। দেখে

শ্রবণ বাঁকে করে বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছে। পরের ছবি শ্রবণের মৃত্যু দৃশ্য ও বাবা-মায়ের বুক ফাটা কান্নার দৃশ্য! মোহন ঠিক করে সেও শ্রবণের মত ভক্তিমান পুত্র হবে।

একবার রাজকোটে একটি যাত্রা দল আসে। তারা 'হরিশ্চন্দ্র' পালা অভিনয় করবে। বাড়ির সকলের সঙ্গে ছোট্ট মোহনও গেছে যাত্রা দেখতে। তন্ময় হয়ে সে যাত্রা দেখে। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করেছেন রাজ্য, ঐশ্বর্য, স্ত্রী, পুত্র সব কিছুই। নিজে সত্য রক্ষার জন্য চণ্ডালের চাকর হলেন। শ্মশানে মড়া পড়ানোর কাজ করেন। রাজরাণী শৈব্যা পথের ভিখারিনী হলেন, পুত্র রোহিতাশ্ব সাপের কামড়ে মারা গেল। দুঃখের পর দুঃখ। তবুও হরিশ্চন্দ্র সত্যের পথ থেকে সরে এলেন না।

মোহনদাসের মনে গভীর ছাপ পড়ল হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর। মোহন ঠিক করে সেও হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যের পূজারী হবে। প্রহ্লাদের গল্পও মোহনদাসের ভাল লাগে। ছোট্ট ছেলে প্রহ্লাদ সত্য রক্ষার জন্য কি কষ্টই না ভোগ করেছে! সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করতে হয় প্রহ্লাদ তা দেখিয়ে গেছে। আর রামচন্দ্র! পিতার সত্য রক্ষা করার জন্য রাজকুমার রামচন্দ্র চোদ্দ বছর ধরে বনে বনে ঘুরে বেড়ালেন! রাজা হবার দিনই তিনি বনে চলে গেলেন! এত বড় ত্যাগ কোথায় আছে? মোহন বুঝলো সত্য পালন রাজা হওয়ার চেয়েও বড়। বালক মোহন মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিকাল বেলা কোন কোন দিন মোহনদাস মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে যায়। বাবার সঙ্গেও কোন কোন দিন যায় বিল্বেশ্বর মন্দিরে। লোধা মহারাজ সেখানে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করেন রোজ। গানের সুরে রামায়ণ পাঠ মোহনের বেশ ভাল লাগে। লোধা মহারাজের জীবনের অপূর্ব কথাও সে শোনে। প্রথম জীবনে

লোধা মহারাজের কুষ্ঠ হয়। সকলে ঘৃণায় দূরে যায়। ডাক্তারের সাধ্য নেই এ রোগ সারায়। রামভক্ত লোধা মহারাজ বিল্বেশ্বর মন্দিরে এসে প্রসাদী বেলপাতা গায়ে লাগান আর রাম নাম জপ করেন। অদ্ভূত ব্যাপার! ধীরে ধীরে কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। রাম নামের মাহাত্ম্যে মোহনের অগাধ বিশ্বাস এলো। সেও রাম ভক্ত হয়ে ওঠে। ভয় পেলে রামনাম করে।

অল্প বয়সে মোহনদাস বিড়ি সিগারেট খাওয়া শুরু করে। নিছক কৌতূহলের বশে মোহন বিড়ি খাওয়া ধরে। কাকা সিগারেট খান, মুখ দিয়ে একগাল ধোঁয়া বার করেন। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উপরে উঠে যায়। বড় ভাল লাগে দেখতে। মোহনেরও ইচ্ছা হয় অমনি করে ধোঁয়া বার করে। কিন্তু বিড়ি পাওয়া যায় কোথায় ? কেন কাকার ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো ? তাই কুড়িয়ে ধূমপান শুরু হলো। কিন্তু এতে বেশি ধোঁয়া বার হয় না। খেয়ে শান্তি নেই। বিড়ি সিগারেট কেনার পয়সাই বা কোথায় পাওয়া যায় ? আরম্ভ হলো চুরি! চাকরদের পকেট থেকে দু-চারটে পয়সা চুরি করে বিড়ি কেনে। কিন্তু এভাবে আর কদিন চলে ? একে ত পয়সা নেই, তায় আবার বিড়ি খাওয়ার স্বাধীনতা নেই। লুকিয়ে খেতে হয়। না, এভাবে আর চলে না! এ জীবন রেখে লাভ নেই। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে। হ্যাঁ, তারা আত্মহত্যাই করবে। ধুঁতরোর বিচি খেয়ে মরবে তারা। কেদারজী মন্দিরের এক নির্জন কোণে বসে দুই বন্ধু মরার আয়োজন করল। দু-তিনটি ধুঁতরোর বিচি সবে খেয়েছে। মনে হলো সামান্য বিড়ি খাওয়ার জন্য তারা আত্মহত্যা করছে ? লোকে শুনে বলবে কি ? না, এ ঠিক হবে না। বরং বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিলেই তো সব সমস্যা মিটে যায়। তারা বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিল।

মাত্র তের বছর বয়সেই মোহনদাসের বিয়ে হয়ে গেল কস্তুর-বাঈয়ের সঙ্গে ; নিজের ইচ্ছায় নয়, বাবা মায়ের ইচ্ছায়। কস্তুর-বাঈ অত্যন্ত সাদাসিদে ছোটখাট মানুষ। দেখে বোঝাই যায় না যে, এতবড় লোকের স্ত্রী। স্বামী সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। গান্ধীজী তাঁকে নিজের হাতে মানুষ করে তোলেন।

বিয়ের পর মোহনদাস আবার পড়াশুনায় মন দেয়। খেলা-ধূলা করা, ব্যায়াম করা কোন দিনই তার ভাল লাগে না। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টার মশায় নিয়ম করেছেন প্রত্যেক ছাত্রকেই খেলা-ধূলা করতে হবে। মোহনদাস কোনদিন মাষ্টার মশায়দের ফাঁকি দেয় নি, মিথ্যাও বলে নি। অগত্যা মোহনদাস মাঠে যায়। একদিন আকাশে খুব মেঘ ছিল, সময় ঠিক করতে না পেরে সেদিন যখন মাঠে গেল তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। সকলে তখন ফিরছে। পরদিন হেডমাষ্টার 'গিমি' কৈফিয়ৎ চাইলেন। মোহনদাস সত্যি কথাই বলল ; কিন্তু মাষ্টার মশায় বিশ্বাস না করে তাকে জরিমানা করলেন। মোহন খুব দুঃখ পেল! পরদিন সে আবার হেড মাষ্টার মশায়কে ব্যাপারটা বললো। তিনি জরিমানা মকুব করলেন। মোহনদাস জীবনে আর কোনদিন দেরী করে নি।

মোহনদাস একবার এক দুষ্টু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। বড়দা নিষেধ করেন, 'মোহন ওর সঙ্গে মিশবি না, ও দুষ্টু ছেলে।' মা সাবধান করে দিয়ে বলনে—'বাবা মোহন, ওর সঙ্গে না মিশলেই ভাল।' মোহন তাঁদের অভয় দিয়ে বলে—'তোমরা কিছু ভেব না, ওকে আমি শুধরে নেব।' কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। বন্ধুটির খপ্পরে পড়ে গেল মোহনদাস। সে মাংস খেত। সে মোহনদাসকে পরামর্শ দেয় মাংস খেতে। মাংস না খেলে শক্তি হয় না, শক্তি না হলে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানো যাবে না। মোহনদাস যুক্তিটি মেনে

নিয়ে মাংস খেতে রাজি হলো ইংরেজ তাড়াবার আশায়। সঙ্গে মেজদাও আছেন। গোঁড়া বৈষ্ণব বংশ। বাবা-মা শুনলে খুব দুঃখ পাবেন। কিন্তু দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হবে যে! বাবা-মা দুঃখ পেলে আর কি করা যাবে। লুকিয়ে মাংস খাওয়া শুরু হল। মোহনের কিন্তু ভাল লাগে না। বাড়ীতে এসে মাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়—ক্ষিদে হয়নি, শরীর ভাল না ইত্যাদি। দিনের পর দিন মাকে মিথ্যা বলতে হয়! তার বিবেকে বাধে। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসে না। মনে পড়ে শ্রবণের কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা, রামচন্দ্র, প্রহ্লাদের কথা। মনে পড়ে যায় তার প্রতিজ্ঞার কথা—তাকে যে শ্রবণের মত পিতৃভক্ত, হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। বন্ধুদের জানিয়ে দেয় মাংস আর সে খাবে না। মাংস খাওয়া ত বন্ধ হলো। কিন্তু মাংস খেয়ে যে মেজদার ধার হয়েছে পঁচিশ টাকার মত। কি করে ধার শোধ হবে? লক্ষ্য পড়লো মেজদার হাতের সোনার তাগার দিকে। তাগার কিছুটা কেটে নিয়ে ধার শোধ করা হল। কিন্তু কাজটা মোহনের পছন্দ হলো না। আবার মিথ্যার আশ্রয়! বাবা মায়ের স্নেহের অপমান করছে সে। নাঃ, বাপ-মায়ের কাছে কিছুই লুকোবে না সে। বাবার কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু বাবার কাছে যেয়ে সব কথা বলবার সাহসও তার নেই। চিঠি লিখে সব কথা জানাবে ঠিক করল। চিঠি লেখা হল। মোহন দাস সব অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল আর অপরাধের সাজা চাইল।

মোহনদাস কাঁপতে কাঁপতে যেয়ে চিঠিখানা বাবার হাতে দিল। বাবা চিঠিখানা পড়লেন! পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মোহনকে তিনি কিছুই বললেন না। চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। মোহন অবাক হয়ে গেল বাবা

কিছু বললেন না দেখে। সে বুঝল সত্য স্বীকার করে বাবাকে সে জয় করেছে। এই শান্ত ক্ষমা ছেলের পক্ষে হল কঠিনতর শাস্তি।

বাবা করমচাঁদ গান্ধী অসুস্থ। ক্রমশঃ শরীর আরো খারাপ হচ্ছে। একদিন সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেলেন! মোহন খুব ভেঙে পড়ে। ধীরে ধীরে পিতার শোক কাটিয়ে ওঠে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন মোহনদাস। ভালভাবে পাশ করলেন। এবার কলেজে পড়ার পালা। ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু বেশীদিন কলেজে পড়া হল না। বাবার বন্ধু মাভজীদেব বললেন কলেজে পড়ে কোন লাভ নেই বরং বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে এলে অনেক লাভ। চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে বটে, তবে ভবিষ্যতে রোজগারের জন্য ভাবতে হবে না। তখন কোন দেশীয় রাজ্যে দেওয়ানী জোটাতে কোন অসুবিধা হবে না।

—'কি রে মোহন, বিলেত যাবি?'—জিজ্ঞেস করেন দাদা। মোহন বলে 'যাবো, কিন্তু আইনের বদলে ডাক্তারি পড়লে কেমন হয়?' মাভজী বললেন—'ডাক্তারী পড়লে তো দেওয়ানী মিলবে না।' দাদা বললেন—'বাবার ইচ্ছা ছিল তুমি আইন পড়। আর বৈষ্ণবের ঘরের ছেলে হয়ে মড়া কাটবে? না তুমি আইন-ই পড়।' দাদা মাকে বললেন কথাটা। মা বললেন, 'তোমার কাকা পোরবন্দরে আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ কর।' মোহন গেলেন কাকার কাছে। দাদা বলে দিয়েছেন—'ঠাকুরদা ও বাবা ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান। সেদিক থেকে ঐ রাজ্য থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দাবীও আছে আমাদের। পোরবন্দরের এডমিনিষ্ট্রেটার সাহেবের সঙ্গে কাকাবাবুর খুব খাতির। কাকাবাবু যদি একটু বলে দেন তবে মোহনের বিলেত

যাওয়ার খরচটা ষ্টেট থেকে ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।' মোহন যথা সময়ে কাকাবাবুর কাছে গেলেন। কাকাবাবুর কিন্তু মোটেই ইচ্ছে নেই মোহন বিলেত যাক্। সে জন্য তিনি বিশেষ গা করলেন না। এডমিনিষ্ট্রেটারকেও কোন চিঠিও দিলেন না। মোহনকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। মোহন বড় আশা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। সাহেব বললেন, 'আগে বি, এ, পাশ কর, তারপর এস, এখন আমি কিছুই করতে পারবো না।' হতাশ হয়ে তিনি রাজকোটে ফিরে গেলেন।

দাদা বললেন যে ক'রে হোক তিনি টাকা যোগাড় করে দেবেন। মোহনকে বিলেতে পাঠাবেনই। মায়ের মন কিন্তু এক কথায় সায় দিতে পারল না। তাঁর মনে নানা সংশয়—বিলেতে যেয়ে নাকি ছেলেরা মদ খায়, মাংস খায়, তাঁর মোহনও তো ঐ সব করবে। মোহন মাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'না মা, তুমি দেখো, আমি কখনো সে রকম হবো না।'

মা তবু গান্ধী পরিবারের বন্ধু জৈন সন্ন্যাসী বেচারজী স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বেচারজী স্বামী মোহনকে ডেকে বললেন —'বাবা মোহন, মায়ের সামনে আজ তোমাকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে—বিলেত গিয়ে মদ খাবে না, মাংস খাবে না আর মেমদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে পারবে না।' মোহন মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন। মায়ের মনে আর কোন সংশয় রইল না।

মোহনদাস বিলেত যাচ্ছেন। স্কুলের বন্ধুদের আনন্দের আর সীমা নেই। তারা সভা করে মোহনের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। মোহনদাস বোম্বাই চলে এলেন। এখানে এসে আর এক বিপদ। বোম্বাই-এর বেনিয়া সমাজ মোহনদাসকে বিলেতে যেতে

বাধা দিল। মোহন সে বাধা অগ্রাহ্য করলেন। শেঠজী বললেন—'সমাজের কথা অমান্য করে তুমি বিলেত গেলে তোমাকে জাতিচ্যুত হতে হবে তা জান?'

'—কি করবো বলুন, এখন আমি নিরুপায়!'

শেঠজীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, বললেন—'বেশ, তাহলে আজ থেকে তুমি জাতিচ্যুত হ'লে!'

মোহনদাস একটু ভয় পেলেন—হয়ত এরা দাদার ওপর জুলুম করবে। কিন্তু দাদা লিখে জানালেন—'কারো কথায় কান দিও না। তুমি নির্ভয়ে বিলেত যাত্রা কর।'

মোহনদাস জাহাজে চড়ে বসলেন। জাহাজে একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী জুনাগড়ের বাঙালী উকিল ত্র্যম্বক রায় মজুমদার। তিনি ও ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেত যাচ্ছেন। ইংরাজিতে কথা বলতে হবে, সেই ভয়ে মোহন সব সময় জড়সড় হয়ে থাকেন। জাহাজ এসে ভিড়ল ইংলণ্ডের সাউদাম্পটন বন্দরে। আপাতত উঠলেন ভিক্টোরিয়া হোটেলে। লণ্ডন প্রবাসী ডাক্তার প্রাণজীবন মেহেতার পরামর্শে একটা বাড়ী ভাড়া করলেন। বড় একা একা লাগে মোহনের। চোখ দিয়ে জল এসে যায়। ডাঃ মেহেতার কিন্তু এ বাড়ীটা পছন্দ হলো না। তিনি মোহনকে নিয়ে এলেন রিচমণ্ড নামে এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে।

গৃহস্বামী রিচমণ্ড চমৎকার লোক। মোহনকে ভাই-এর মত দেখেন। কিন্তু এত শীতের দেশে মাংস না খেলে শরীর টিকবে কি করে? তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মোহন বলে—'মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি মদ মাংস ছোঁব না।' তিনি আর জোর করেন না। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যাই করুন, মোহনদাস ঠিক করলেন বিলাতের সমাজে মিশতে গেলে তাঁকে পুরোদস্তুর সাহেব হতে হবে।

প্রসাধনে বহু সময় দেন, নাচের ক্লাশে ভর্তি হলেন, বেহালা কিনে ভর্তি হলেন বাজনা শেখার স্কুলে, ভাল বক্তৃতা শেখার জন্য একজন ভাল বক্তার ছাত্র হলেন। সমস্ত খরচ দাদা কষ্ট করে পাঠাচ্ছেন। মোহনদাসের হঠাৎ কি মনে হল—ভাবলেন, কি হবে ইংরাজি বক্তৃতা শিখে, কি হবে নাচ, গান, বাজনা শিখে ? সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়,—দেশে ফিরে কোন কাজেই লাগবে না। তিনি সব কিছু ছেড়ে দিলেন।

মোহনদাস ব্যারিষ্টারি পড়া শুরু করলেন। ব্যারিষ্টারিতে ভোজ-সভাতে যোগদান করাটাই বড় ব্যাপার। মোহনদাস ভোজ-সভায় নিয়মিত যোগ দেন। ভোজ-সভায় মদ মাংসের ব্যবস্থা থাকে। গান্ধী তা খান না। বন্ধুরা তাঁকে দলে টানে। ফোকটে মোহনের ভাগের মদ মাংস খাওয়া যায়। অথচ দামটা মোহনদাসকেই দিতে হয়। মোহনদাস কর্তৃপক্ষকে বলে নিরামিষের ব্যবস্থা করে নিলেন।

লণ্ডনে নিরামিষ ভোজীদের সমিতিতে মোহনদাস ভর্তি হলেন। নিজের পাড়াতেই নিরামিষ ভোজীদের নিয়ে একটা ক্লাব করলেন। তিনি নিজেই তার সম্পাদক।

এতদিন মোহনদাস হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না। হঠাৎ তাঁর দুজন ইংরেজ বন্ধু জুটে গেল, তাঁরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। একদিন তাঁরা মোহনকে নিয়ে গেল ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও এ্যানি বেসান্তের কাছে। বন্ধু দুজন মোহনকে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে বলেন। মোহন 'না' আর করতে পারলেন না। ইস্কুলের যেটুকু সংস্কৃত বিদ্যা ছিল, তাই সম্বল করে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা শুরু করেন। গীতার পরে বাইবেল পড়লেন। পড়লেন বুদ্ধদেবের জীবনী 'লাইট অব এশিয়া।' ক্রমে ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মালো।

অনেক দিনের আশা মোহনদাস ফরাসী দেশ দেখবেন। ফরাসী বিপ্লবের লীলাভূমি এই দেশ। দিন সাতেকের জন্যে মোহনদাস ইংল্যাণ্ড থেকে ফরাসী দেশে বেড়াতে গেলেন। তখন সে দেশে বিরাট বড় এক প্রদর্শনী হচ্ছে। মোহনদাস অবাক বিস্ময়ে এই আশ্চর্য দেশ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। হাজার ফিট উঁচু ইফেল-টাউয়ারে উঠলেন কয়েকবার। নৎরদাম গীর্জা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

মোহনদাস ব্যারিষ্টারি পাশ করলেন। ১০ই জুন পরীক্ষার ফল বার হলো। ছাত্র জীবন শেষ। এবার দেশে ফেরার পালা। ১২ই জুন মোহনদাস জাহাজে উঠে বসলেন।

মোহনদাস চলেছেন দেশে। কতদিন তিনি মাকে দেখেন না! মায়ের কাছে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। মা শুনে খুব খুশী হবেন। দেশের খাবার কতদিন খান নি। মায়ের হাতে খেতে খেতে মাকে বিলাতের গল্প বলবেন। আর মা অবাক হয়ে তা শুনবেন। বোম্বাই-এ জাহাজ থেকে নামলেন মোহনদাস। দাদা এসেছেন তাঁকে নিতে। জাহাজ থেকে নেমেই মোহন বললেন, 'চল' আগে মাকে প্রণাম করি।' দাদার চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে,—মা তো নেই ভাই।'

'মা, নেই!'—আর্তনাদ করে ওঠেন মোহন।

'না। তোমার পড়ার ক্ষতি হবে ভেবে মায়ের মৃত্যুর খবর তোমাকে জানাই নি।'

মোহন চোখে যেন অন্ধকার দেখলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দাদার কোন কথাই যেন শুনতে পাচ্ছেন না। সব কিছু মোহনের কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। মাতৃভক্ত মোহন মাকে শেষ দেখা দেখতে পারলেন না!'

———

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন

'তুমি বড় ছিলে তাও জানি
কিন্তু এতবড় এতখানি !
আগে কে জানিত এত বড় তব প্রাণ
হে সাধক, হে মহান, হে মহীয়ান।'

—কবি বর্ণিত এই সাধক, মহান ও মহীয়ান মানুষটি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইতিহাসের এক বিস্ময়কর পুরুষ। বিধাতা পুরুষের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিশাল হিমালয়ের মত উন্নত, বৈষ্ণবের মত আত্মসমর্পিত প্রাণ। দেশের মুক্তিযজ্ঞের একনিষ্ঠ সাধক। পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ। ত্যাগে দধীচি, দানে কর্ণ।

পুণ্যভূমি ভারত। অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভারত। ভোগ নয়, ত্যাগ ভারতের মর্ম কথা। 'বিত্ত হতে চিত্ত বড় এই ভারতের বাণী।' তাই দেখা যায় কত শত রাজকুমার রাজবেশ ত্যাগ করেছেন ত্যাগের সাধনায়, চিত্তের সাধনায়। অমিতাভ বুদ্ধ রাজ ঐশ্বর্য হেলায় ফেলে মানব কল্যাণের ব্রত নিয়েছেন। দ্বারে দ্বারে অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। নদীয়ার প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করে কৌপীন বস্ত্র পরেছেন। ভারতের ঘরে ঘরে হরিনামের প্রেম-অমৃত বিতরণ করেছেন। বিগত শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। 'যত মত তত পথ'— শোনালেন অপূর্ব কথা। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের বিস্ময়। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'—ছিল তাঁর জীবন ব্রত। অর্ধনগ্ন ফকির মহাত্মা গান্ধী এই তীর্থভূমির আর এক সুসন্তান।

'অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয়' এই মহাবাণীর জীবন ব্যাপি সাধক তিনি।

মহাভারতের এই সকল মহামনীষীর যোগ্য উত্তর সাধক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের জনৈক জীবনীকার লিখেছেন, 'চিত্তরঞ্জন ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর জ্বলন্ত সাহস, নেপোলিয়নের বীরত্ব, ওয়াশিংটনের প্রতিভা, শ্রীচৈতন্যের আত্মা, বুদ্ধের তপস্যা, হরিশচন্দ্রের দান লইয়া এই বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' মহাত্মা গান্ধী শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, 'দেশবন্ধু মরেন নি, দেশবন্ধু চিরজীবী হোন।' রবীন্দ্রনাথ ভক্তি নম্র চিত্তে বললেন, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

চিত্তরঞ্জনের জন্ম কলকাতায় ; কিন্তু তাঁর পিতৃভুমি বিক্রমপুর। প্রাচীন গৌড়ভূমির প্রাণকেন্দ্র এই বিক্রমপুর। কত না স্মৃতির, কত না বীর্য গাথার, কত না সভ্যতার কাহিনী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই পুণ্য ভুমি। আদিস্থুর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন এই পবিত্র পীঠস্থানে। সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ মন্ত্রপুত শান্তি জলে শুষ্ক গজারী বৃক্ষে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন এখানেই। সুদূর সিংহল, বালী, সুমাত্রা, আরবের বাণিজ্য তরীর আনাগোনা ছিল এখানে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র বুদ্ধের শরণ নিয়েছিলেন এখান থেকেই। চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বীর্য-গাথা বুকে ধরে আছে এই বিক্রমপুর। আজকের ঢাকা-বিক্রমপুর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র।

বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রাম। এই গ্রামের দাশ পরিবার দানে, ধ্যানে, সেবায় সকলের আগে। বিরাট ঐতিহ্য এই পরিবারের। যদুনন্দন বৈদ্য বংশীয় এঁরা। এই শিক্ষিত সংস্কৃতিবান দাশ বংশের উত্তর পুরুষ চিত্তরঞ্জন। যদিও চিত্তরঞ্জনের জন্ম কলকাতায় তবু বিক্রমপুরের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও

ভালবাসা। তিনি বলেছেন, 'যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশেই ঘুরে বেড়াই না কেন, যখনি মনে করি আমি বিক্রমপুরবাসী তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর আমার শরীরের শিরায় শিরায়, আমার অস্থি মজ্জাগত।'

তেলিরবাগের দাশ বাড়ির জগদ্বন্ধু দাশ ও কাশীশ্বর দাশ খুড়তুতো জ্যাঠ্‌তুতো ভাই। জগদ্বন্ধু বিক্রমপুরের বিখ্যাত আইনজীবী। দুই ভাই খুব দানশীল। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করেন। শাস্ত্রে বলে অতিথি দেবতা। এঁরা অক্ষরে অক্ষরে এই শাস্ত্র বাক্য পালন করেন। তেলিরবাগের দাশেদের দানশীলতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের অথিতিশালা ছিল। অনেক কর্মচারী তাদের দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত হন। ঠিকমত অতিথি সেবা হচ্ছে কিনা গৃহকর্তা মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতেন। একবার রাত দুপুরে কাশীশ্বর অতিথির বেশে গিয়ে বল্লেন, 'দ্বারে অভুক্ত অতিথি, দুটি অন্ন প্রার্থনা করি।' 'এই অসময়ে কে তোমার জন্য অন্নের থালা সাজিয়ে বসে আছে ?'—ঝঙ্কার দিয়ে উঠল জনৈক কর্মচারী। কোন মতেই স্থান পেলেন না অতিথিশালায়! মনে বড় দুঃখ পেলেন। এই তাঁর কর্মচারী! আর অতিথি সেবায় এই নমুনা! পরদিন কর্মচারীদের ডাকিয়ে সাবধান করে দিলেন। কাশীশ্বর সুকবিও ছিলেন। তাঁর লেখা 'নারায়ণ সেবা, ও 'হরির লুটের পুঁথি' বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে সবার প্রিয় ছিল।

জগদ্বন্ধু নিঃসন্তান ছিলেন। কাশীশ্বরের তিন ছেলে—কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন। জগদ্বন্ধু ভুবনমোহনকে দত্তক নেন। কালীমোহনের দুই ছেলে—মনোরঞ্জনও নিত্যরঞ্জন। নিত্যরঞ্জন অল্প বয়সেই মারা যান। মনোরঞ্জনও একমাত্র মেয়ে কুসুম কুমারীকে রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। দুর্গামোহনের তিন

ছেলে, তিন মেয়ে। তিন ছেলেই ব্যারিষ্টার। সতীশ রঞ্জন ভারতের এ্যাডভোকেট জেনারেল, জ্যোতিষ রঞ্জন রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ, আর সত্যরঞ্জন কলকাতা হাইকোর্টরে ব্যারিস্টার। তিন মেয়ে সরলা অবলা ও শৈলবালা। অবলা দেবী বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের পত্নী।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর বাংলা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্তিক পটলডাঙ্গার বাড়িতে এ যুগের দধীচি চিত্তরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হলেন। বাবা ভুবনমোহন, মা নিস্তারিনী দেবী। যৌবনকালেই ভুবনমোহনরা তিন ভাই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন ব্রাহ্ম সমাজের দু জন প্রথম শ্রেণীর নেতা ছিলেন। বহুবিধ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তখন এঁরা তেলিরবাগ থেকে বরিশালে এসে বাস করছেন। সেখানেই আইন ব্যবসা করেন। এই বরিশালেই সর্বপ্রথম দুর্গামোহন বিধবা বিয়ের আয়োজন করেন নিজের বাড়িতেই। পাত্রী আর কেউ নয়, নিজের অল্প বয়সী বিধবা বিমাতা। চার দিকে হৈ, চৈ পড়ে গেল। এ নিয়ে কত ছড়া, পাঁচালি পূর্ব বাঙলায় রচিত হলো—

ব্রহ্ম সমাজের কথা কি বলিব আর
দুর্গামোহন দিল বিয়া নিজ বিমাতার।

কিন্তু কোন কিছুতেই দুর্গামোহন ভুবনমোহন একচুলও বিচলিত হলেন না।

এঁরা তিন ভাই বিখ্যাত আইনবিদ। কালীমোহন খুব তেজস্বী পুরুষ। ছোট ভাই ভুবনমোহন হাইকোর্টে ওকালতি করেন। আইন-ব্যবসায়ে প্রভুত পরিমানে অর্থ আয় করেন। কিন্তু দাশ-পরিবারের ধারা তাঁর রক্তে। টাকা তিনি রাখতে পারেন নি।

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য ও আচরিত পথ ত্যাগ করেন নি। গরীব দুঃখীর জন্য তাঁর দরজা সব সময়ই খোলা। খালি হাতে কেউ ফেরে না। এমন কি ঋণ করেও দান করেন। অবশেষে ঋণে ঋণে একেবারে ডুবে গেলেন। পর্বত প্রমাণ ঋণ। পাওনাদারের তাগাদা অহরহ। শোধ করবেন কি করে! কিন্তু কোন দিকেই দৃষ্টি নেই তাঁর। দরিদ্রের বন্ধু তিনি। দীনবন্ধু ভুবনমোহন ঋণী হয়েও দীনের সেবা ভোলেন নি। এমন বাবার ছেলে বলেই তো চিত্তরঞ্জন সর্বত্যাগী। ঋণ ভারে জর্জরিত ভুবনমোহন কোন উপায় না দেখে অবশেষে দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখালেন। আইনকে ফাঁকি দিলেন বটে, কিন্তু বিবেকের দংশনে মরমে মরে গেলেন। অবশ্য চিত্তরঞ্জন কর্মজীবনে প্রবেশ করে পিতৃঋণ শোধ করেন; যদিও আইনত তিনি তা করতে বাধ্য ছিলেন না। সাংবাদিকতায় ভুবনমোহন সেকালের প্রথম শ্রেণীর একজন ছিলেন। প্রথমে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও পরে 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

মা নিস্তারিণী দেবী। মাত্র ন' বছর বয়সে তিনি স্বামীর হাত ধরে দাশ-পরিবারে প্রবেশ করেন। তখন এই সংসারে একটি অদ্ভুত নিয়ম ছিল। এ বাড়িতে একবার বৌ হয়ে ঢুকলে আর বাবার বাড়ী গিয়ে থাকা চলত না। ছোট্ট বৌ, মায়ের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তখন বাপের বাড়ি থেকে মাকে আনানো হত, তবু বৌকে পাঠান হত না। এই নিষ্ঠুর নিয়মের বিরুদ্ধে নিস্তারিণী দেবীর কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। বলতেন, 'এত বড় বংশের উপযুক্ত বৌ তো আমাকে হতে হবে!' তিনি খুব শিক্ষিতা ছিলেন না। তবে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান স্বামীর সাহচর্যে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আকাশের মত

উদার, স্নেহ কোমলতায় ভরা ছিল তাঁর হৃদয়। এহেন মা ও বাবার উপযুক্ত সন্তান চিত্তরঞ্জন।

চিত্তরঞ্জনের বয়স যখন মাত্র কয়েক বছর, তখন তাঁর বাবা মা পটলডাঙ্গা থেকে চলে আসেন দক্ষিণ কলকাতার পিপুল পটি রোডে। এই রাস্তা পরে রসা রোড নামে পরিচিত হয়। তখন দক্ষিণ কলকাতায় লোক বসতি খুব কম। মাত্র কয়েক ঘর লোকের বাস। কালীমোহনই প্রথম এ অঞ্চলে বাস স্থাপন করেন। পরে ১৪৮ নং রসা রোডে উঠে আসেন। কালীমোহন এই বাড়িটি করেন। কিন্তু তিন ভাই এই বাড়িতে এক সঙ্গে বাস করেন। একান্নবর্তী পরিবারের এক আদর্শ নমুনা এই দাশ পরিবার। ভাই-এ ভাই-এ অদ্ভুত প্রীতি ও সখ্য।

১৪৮ নং রসা রোডের বাড়ি (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন) ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক পীঠ- ভূমি। কলকাতার কীর্তিখ্যাত বাড়িগুলির অন্যতম এটি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও সিংহীবাড়ি, কলুটোলার রামকমল সেনের বাড়ি, রামবাগানের দত্ত বাড়ি, রসা রোডের মুখুজ্জে বাড়ি ও দাশ বাড়ি উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের কেন্দ্র স্থল ছিল। চিত্তরঞ্জন আজীবন এই বাড়িতেই কাটান। অতীতের কত গৌরব কাহিনী জড়িত এ বাড়ির সঙ্গে। ঋষি বঙ্কিমের পদধূলি অঙ্গে মেখে ধন্য এ বাড়ি; রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্নাত এ ভবন। এ বাড়ী মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছে। বাংলার অগ্নিযুগের অগ্নিশিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ও এ বাড়ি। লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়, সরোজিনী নাইডু, জিন্না, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, এ্যানি বেসান্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি ভারত বরেণ্যদের পদরজ গায়ে মেখে ধন্য এ বাড়ি। কত স্মৃতি, কত ইতিহাস এ বাড়ির।

'এই ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'—চিত্তরঞ্জনের জন্মলগ্নে দুর্গামোহন ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তিনি সত্যই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে তাঁর কথা চিত্তরঞ্জনের জীবনে সত্য হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন নাম তাঁর সার্থক। বিশ্ব জনের চিত্ত তিনি রঞ্জিত করেছিলেন। একটা মহৎ পরিবারে জন্ম। পরিবারের এই মহত্ত্ব তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। দুর্গামোহনের বড় আশা, 'আমাদের বংশে যদি কেউ মানুষ হয়, তবে এক চিত্তই হবে।' চিত্ত মানুষের মত মানুষ হয়েছিলেন। দুর্গামোহনের আশা পূরণ করেছিলেন।

১৮৭৮ সাল। আট বছর বয়স চিত্তর। এবার লেখা পড়ার পালা। ভর্তি হলেন ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। অধ্যক্ষ মিষ্টার অ্যাসটন। আট বছর এই বিদ্যালয়ে পড়েন। ১৮৮৬ সালে এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। স্কুলের পাঠ শেষ, এবার কলেজ। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সদা আনন্দময় তিনি। একটা আকর্ষনী শক্তি ছিল তাঁর মধ্যে। সকলের নেতা তিনি। বাড়িতেও তিনি ভাই-বোনদের কেন্দ্রমণি। তাঁরা তাঁকে নেতা বলে মানে। লেডি অবলা বসু বলেছেন, 'চিত্ত আমাদের সবাইকে চারিদিকে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে কি বক্তৃতাই না দিত!' ছোট বেলা থেকেই চিত্ত খুব মাতৃভক্ত। গুণী মায়ের গুণী ছেলে। মা খুসী, বাবা আনন্দিত এ ছেলেকে নিয়ে।

শিশু বয়স থেকেই চিত্ত বড় আত্মভোলা। কিন্তু পড়াশুনায় খুব মনোযোগী। একদিন সকালে চিত্ত একমনে বসে পড়ছেন। মা

সামনে দুধের বাটি রেখে গেছেন। মা অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন 'দুধ খেয়েছিস চিত্ত?' 'দুধ? বাটিটা দেখতো মা খেয়েছি কি না?' এমনি আত্মভোলা ছিলেন তিনি। এন্ট্রান্স ক্লাশের ছাত্র তখন চিত্ত। বাড়িতে অনেক আত্মীয়ের ছেলে পড়ে। একদিন তো তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড় জামা পরে খেতে বসেছেন। তাঁকে দেখে সকলে হাসি চেপে রাখতে পারল না। ব্যাপার কি? না, চিত্তর গায়ে ঐ ডোরাকাটা বেখাপ্পা জামা কেন? দু-সাইজ ছোট সে জামা। অম্লান বদনে চিত্ত সেই জামা পরে খেতে বসেছেন। 'দাদা এটা কি পরেছ?' বোনেরা জিজ্ঞেস করে। এতক্ষনে খেয়াল হলো তাঁর। এ জামা তো তাঁর নয়। বল্লেন, 'ও তাইতো, এটা যে ইন্দুর সার্ট, আমার গায়ে তো এটা হয় না—ভারি ভুল হয়ে গিয়েছে।' ছোটবেলায় তিনি দুষ্টুও কম ছিলেন না। ছুটির দিনে দুপুর বেলায় হঠাৎ চিত্তর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সে? খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল চারদিকে। অবশেষে তাঁর খোঁজ মিলল আমবাগানে। কোঁচড় ভর্তি আম, হাতে ছুরি। কিন্তু কি আশ্চর্য! চিত্ত যে আম গাছের নীচে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

চৌদ্দ বছর মাত্র বয়স তখন তাঁর। তখন থেকেই কবিতা রচনায় পারদর্শী। সাহিত্যে তাঁর খুব অনুরাগ। অঙ্ক তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না অঙ্কের ক্লাশে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখেন। পকেট ভর্তি থাকতো টুকরো কাগজে। প্রত্যেকটি কাগজে একটি কবিতা। টিফিনের সময় বন্ধুদের শোনান।

ষোল বছর বয়সে চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর ভগ্নীপতি ডক্টর পি. কে. রায় তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ। তিনিই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। এই কলেজে তিনি চার বছর পড়াশুনা করেন। ১৮৯০ সালে এখান

থেকেই বি. এ. পাশ করেন। কারণ এ সময়ে কলেজে তিনি পড়াশুনায় খুব অবহেলা করেন। ব্যস্ত ছিলেন বিতর্ক সভা, ছাত্র সমিতি প্রভৃতি নিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বাংলা ভাষার জন্য লড়েছিলেন। প্রবেশিকা ও এফ. এ. পরীক্ষায় বাংলাকে বিকল্প দ্বিতীয় ভাষা করার আন্দোলন করেন। কিন্তু তখন তা ব্যর্থ হয়। চিত্তরঞ্জন ছাত্র সভার একজন উৎসাহী কর্মী। ছাত্র সভার একাধিক অধিবেশনে তাঁকে



অবশেষে তাঁর খোঁজ মিলল আমবাগানে (পৃঃ ৯৫)

বক্তৃতা করতে হয়। এই সময়ে তাঁর বাগ্মিতা ও সাহিত্য প্রতিভা সহপাঠী ও অধ্যাপকদের বিস্মিত করে।

কলেজের পাঠ শেষ। বি. এ. পাশ করেছেন চিত্তরঞ্জন। ভুবনমোহনের একান্ত ইচ্ছে চিত্তকে আই. সি. এস. করা। বাঁধা মাইনের স্থায়ী চাকরি। সমাজে খ্যাতি, প্রতিপত্তিও কম নয়।

দুর্গামোহনের অবশ্য ইচ্ছা চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারি পড়েন। ভুবনমোহন তাতে সায় দিলেন না। কারণ তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ ; আর তাছাড়া—ব্যারিষ্টারিতে নাম করাও কঠিন। এ সব চিন্তা করে ভুবনমোহন চিত্তরঞ্জনকে আই. সি. এস. এর জন্যে বিলেতে পাঠাবেন স্থির করলেন। বিধাতা পুরুষ অলক্ষে থেকে বুঝি বা একটু হাসলেন। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আই. সি. এস. হওয়ার জন্যে চিত্তরঞ্জন বিলেত গেলেন, ফিরলেন ব্যারিষ্টার হয়ে।

১৮৯০ সাল। চিত্তরঞ্জন বিলাতে যাচ্ছেন। সঙ্গী প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী ও বন্ধু, জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত। তিনিও আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবেন। দুজনে 'রাভেনা' জাহাজে চড়ে চলেছেন ইংল্যাণ্ড। দু-জনের চোখে রঙীন স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ আই. সি. এস. হওয়ায় সাধ। যাত্রা শেষে পদার্পণ করলেন লণ্ডনের মাটিতে।

চিত্তরঞ্জন আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। রেন ও গার্নে নামে দুজন বিখ্যাত অধ্যাপকের নিকট দু বছর নিয়মিত পড়লেন। ১৮৯২ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন। যথা সময়ে পরীক্ষার ফল বার হল। কিন্তু আশ্চর্য, চিত্তরঞ্জনের নাম নেই। বন্ধু জ্ঞানেন্দ্র গুপ্ত পাশ করেছেন। এ সংবাদ শুনে বাবা ভুবনমোহন খুব দুঃখ পেলেন ; মর্মাহত হলেন তিনি। তাঁকে আবার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

চিত্তরঞ্জন কেন পরীক্ষায় ভাল করতে পারেন নি। তিনি কি পড়াশুনায় এতই খারাপ ? না, তা নয়। তাঁর ফেল হওয়ার মূল কারণ রাজনীতি। পড়াশুনার চেয়ে রাজনীতির চর্চা একটু বেশী মাত্রায় করে ফেলেন। আই, সি, এস পরীক্ষা আর ক'দিন মাত্র বাকী। একটা সভায় পার্লামেন্টের সদস্য জেমস্ ম্যাকলীন বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে দুটি মন্তব্য করলেন। মন্তব্য দুটি ভারতীয়দের

কাছে মোটেই গৌরবের নয়। ভারতীয় মুসলমানদের তিনি বললেন দাস (slaves) আর ভারতীয় হিন্দুদের সম্বন্ধে বললেন চুক্তিবদ্ধ দাস (indentured slaves)। দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন এ অপমান সহ্য করতে পারলেন না। এর একটা প্রতিকার চাই। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। লণ্ডনের এক্সেটর হলে অবিলম্বে একটা সভা ডাকলেন। লণ্ডনের সমস্ত ভারতীয়দের ডাকলেন সেখানে। জ্বালাময়ী ভাষায় ম্যাকলীনের সেই দম্ভোক্তির প্রতিবাদ জানালেন। এই প্রতিবাদের ফল সঙ্গে সঙ্গে হলো। বিলাতের বড় বড় কাগজে তাঁকে সমর্থন করে অনেক সম্পাদকীয় বার হলো। লিবারেল দলের গ্লাডষ্টোন তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। লিবারেল দল ওল্ডহামে একটি সভা ডাকলো। সভাপতি গ্লাডষ্টোন। চিত্তরঞ্জন সে সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত হলেন। তিনি তীব্র ভাষায় ম্যাকলীনের সমালোচনা করেন। চারদিকে এ নিয়ে ভীষণ আন্দোলন শুরু হল। বেচারা ম্যাকলীন প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শুধু ক্ষমা চেয়েই পার পেলেন না। পার্লামেন্টের সদস্যপদও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। এ ঘটনাও চিত্তরঞ্জনের আই, সি, এস হওয়ার পথে বিরাট বাধা। ১৮৯৩ সালের নির্বাচনে দাদাভাই নৌরজী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য হওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়ালেন সেন্ট্রাল ফিনস্‌বারি কেন্দ্র থেকে। লর্ড স্যালিসবারি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। এর আগে বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরে যান। এবার তাই দাদাভাই নৌরজির জন্য ভারতীয় ছাত্রেরা বিশেষ চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন দাদাভাই-এর নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজের পড়াশুনার কথা ভুলে গেলেন। একের পর এক নির্বাচনী

সভায় বক্তৃতা করে চলেছেন। প্রচার অভিযানে অন্যতম সঙ্গী অরবিন্দ ঘোষ। অল্পদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন বক্তা হিসাবে ইংল্যাণ্ডে খ্যাতি লাভ করলেন। লর্ড স্যালিসবারি নৌরজিকে 'The black man of India' বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন লর্ডকে মুখের ওপর জবাব দিতে ছাড়েন নি। দাদাভাই নৌরজি নির্বাচনে জয়লাভ করলেন কিন্তু চিত্তরঞ্জন আই, সি, এস পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না।

ভুবনমোহনের নির্দেশে চিত্তরঞ্জন পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে আবার পরীক্ষা দিলেন। এবার তিনি অধ্যাপক রীডের কাছে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করেন। 'আশা করছি এবার আমি কৃতকার্য্য হব'—চিত্তরঞ্জন টেলিগ্রামে জানালেন বাবাকে। সেবারের অন্যতম পরীক্ষার্থী স্যার এ্যালবিয়ন ব্যানার্জীও বন্ধুদের জানালেন 'চিত্ত এবার নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে।' পরীক্ষার ফল বেরুল। কিন্তু নতুন আই, সি, এস-দের নামের তালিকায় তাঁর নাম এবারেও দেখা গেল না। সাহেবদের মুখের ওপর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার অপরাধের শাস্তি কি তাঁকে এভাবেই পেতে হল ?

যাই হোক, বার বার দুবার আই, সি, এস পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় ভুবনমোহন হাল ছেড়ে দিলেন। অগত্যা তিনি চিত্ত-রঞ্জনকে ব্যারিস্টারি পড়তে সম্মতি দিলেন। ১৮৯৩ সালে মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিলেন। পাশও করলেন। আই, সি, এস হতে গিয়েছিলেন। হতে পারলেন না। বাবার স্বপ্ন, সাধ পূরণ হলো না। বাবা ক্ষুণ্ণ হলেন। মা দুঃখ পেলেন। আত্মীয় স্বজনেরা অসুখী। কিন্তু ভারত-ভাগ্য-বিধাতা খুশী হলেন। যিনি ভবিষ্যৎ ভারতে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন, যিনি নব-ভারত গড়ে তুলবেন তাঁর পক্ষে ইংরেজের বেতনভুক কর্মচারী হওয়া কি সাজে ?

১৮৯৪ সালের গোড়ার দিকে চিত্তরঞ্জন দেশে ফিরলেন। ফিরলেন ব্যারিস্টার হয়ে। তেলিরবাগের দাসবংশ উকিল ব্যারিস্টার জজের বংশ বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। চিত্তরঞ্জন বংশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখলেন। ব্যারিস্টার দুর্গামোহনের আশা পূরণ হলো। আশা পূরণ হলো কোটি কোটি ভারতবাসীর। ভারত পেল এক সুসন্তানকে।

কবি নজরুল ইসলাম অগ্নিযুগের এই মহাবিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানালেন—

নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।

···ভাবী কথাশিল্পী···

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা। অনেক পড়ুয়া সেখানে। পণ্ডিত মশায়ের খুব তামাকের নেশা। পাঠশালায় ধূমপানের সব ব্যবস্থাই আছে। একদিন তিনি কলকের তামাক ও টিকে সাজিয়ে একটু বাইরে গেছেন। ফিরে এসে আগুন ধরিয়ে তিনি খুব টানতে লাগলেন। কিন্তু ধোঁয়া ত বার হয় না। ব্যাপার কি? তিনি কলকে উপুড় করলেন। এ কি! তামাকের বদলে ইঁটের টুকরো! কার এ কাজ? পণ্ডিত মশায় রেগে আগুন। একটি ছেলে ভয়ে ন্যাড়ার নাম বলে ফেলল। বেত হাতে তেড়ে এলেন পণ্ডিত। ততক্ষণে ন্যাড়া হাওয়া। সে পাঠশালার সবচেয়ে দুরন্ত ছেলে। মা রেগে বলেন, 'এ ছেলে মানুষ হবে না।' ঠাকুরমা বললেন, 'তুমি দে'খো বৌমা এ ছেলের মতিগতি একদিন ফিরবে, আমি বলছি ও দেশের মধ্যে একজন বলে গণ্য হবে।' হ্যাঁ, দুরন্ত ন্যাড়া দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছিলেন। ঠাকুরমার কথা মিথ্যে হয় নি। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই দস্যি ছেলে ন্যাড়া। বাংলার দরদী কথা শিল্পী তিনি। বিচিত্র তাঁর জীবন কাহিনী। জীবন নয় তো যেন একটি উপন্যাস। ছোটবেলায় দুঃখ, দারিদ্র তাঁর সঙ্গী। আবার তেমনি দুরন্ত, সাহসী, বেপরোয়া। দুঃখী মানুষের কথা, পীড়িত মানুষের কথা তাঁর অমর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালীর মনের মণিকোঠায় তাঁর অমর আসন।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে মামুদপুর গ্রাম। এই গ্রামের চাটুজ্জে

বাড়ির ছেলে মতিলাল। মতিলালের বাবা ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা মানুষ। জমিদারের সঙ্গে বাধল তার সংঘর্ষ। ফল যা হওয়ার তাই হলো। স্নানের ঘাটে একদিন তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃত দেহ পাওয়া গেল। বিধবা মা মতিলালকে নিয়ে এসে উঠলেন বাপের বাড়ী, হুগলীর দেবানন্দপুর গ্রামে। মামারা চারকাঠা জমি দিলেন। মতিলাল সেখানে বাড়ি করলেন। অল্প বয়সে হালিসহরের কেদারনাথ গাঙ্গুলীর মেজ মেয়ে ভুবনমোহিনীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়। কেদারনাথ ভাগলপুরে জামাইকে নিয়ে এলেন। স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হলেন। তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। স্বাধীন, মুক্ত আপনভোলা। গাঙ্গুলী বাড়ির কড়া শাসনের মূর্তিমান বিদ্রোহ তিনি। খেয়ালী মানুষ, স্বপ্নালু মনা মতিলাল একদিন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করলেন। পাটনা কলেজে কিছুদিন পড়েন। যথাসময়ে তাঁর একটি মেয়ে হয়। দ্বিতীয়বার ছেলে হয়ে মারা যায়। তাই সংস্কারের বশে মতিলাল দেবানন্দপুর চলে এলেন। এই 'দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রামে' জন্ম নিলেন এক দেবশিশু মতিলালের ঘর আলো করে।

পুণ্যভূমি দেবানন্দপুর। কত পুরনো স্মৃতি তার বুকে। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর সপ্তগ্রাম। দেশ বিদেশের কত বাণিজ্য জাহাজের নিত্য আনাগোনা সেখানে। এই সপ্তগ্রামের একটি গ্রাম দেবানন্দপুর। সাতজন ঋষি নাকি এই সাতটি গ্রামে তপস্যা করেন। তাই সপ্তগ্রাম নাম। ঋষির সাধনপীঠ দেবানন্দপুরে আধুনিক যুগের আর এক ঋষির আবির্ভাব। সাহিত্য সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

সেদিনটি ছিল ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬)। মা ভুবনমোহিনীর কোলে ভুবনমোহন এক শিশুর

আবির্ভাব হল। শরৎচন্দ্রের মায়ের রূপ ছিল না, কিন্তু গুণে তিনি সত্যিই ভুবনমোহিনী। সকলের প্রিয় তিনি। সব থেকে বড় কথা শরৎচন্দ্রের মা তিনি, রত্নগর্ভা। স্বামী মতিলাল সর্বত্যাগী ভোলানাথ ; কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা অবিচল। একদিকে আপনভোলা নিঃস্ব স্বামী, অন্যদিকে দুরন্ত ছেলে শরৎ—এই নিয়ে তাঁর ঘর। অসাধারণ ধৈর্য্য তাঁর। কোনো শাসন তিনি জানেন না—সম্বল কেবল হৃদয়ের ভালবাসা, স্নেহ। এই স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে বিবাগী স্বামীকে বেঁধে রেখেছিলেন।

খুব ছোটবেলায় শরতের মাথায় ঘা হয় ; ফলে মাথার চুল উঠে যায়। সেই থেকে ঠাকুরমা আদর করে 'ন্যাড়া' বলে ডাকেন। বন্ধুরাও ডাকে ন্যাড়া। ক্রমে ন্যাড়া নামে শরতের পরিচয় পাড়ায়, গ্রামে, পাঠশালায়। ন্যাড়ার দু তিন বছর বয়সের সময় মতিলাল ভাগলপুরে এলেন। এখানেই তার হাতে খড়ি। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ দিয়ে পাঠ শুরু।

শরৎচন্দ্রের পাঁচ-ছ বছর বয়সের সময় মতিলাল আবার দেবানন্দপুর চলে এলেন। প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হলো ন্যাড়া। পাঠশালার সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে সে। আবার সেরা মেধাবী ছাত্র সে। পণ্ডিত মহাশয়ের ছেলে কাশীনাথ তাঁর প্রিয় বন্ধু। এই কাশীনাথ অমর হয়ে আছে শরৎ সাহিত্যে। ন্যাড়ার দুরন্তপনায় পাড়ার লোক অতিষ্ঠ, গুরুমশায় ত্রস্ত, বন্ধুরা ব্যস্ত। নদীতে বা পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরে, কখনো বা বাগান থেকে ফল চুরি করে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।

দুষ্টুমির জন্যে ন্যাড়াকে পাঠশালা ছাড়তে হলো। মতিলাল তাকে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেন। গ্রামের লেঠেল নয়ন সর্দার একবার বসন্তপুরে গরু কিনতে যাচ্ছে। চুপি চুপি

ন্যাড়াও তার সঙ্গ নেয়। ফিরবার পথে তারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়ে। অতি কষ্টে নয়ন ন্যাড়াকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে।

বেকার মতিলাল শোন নদীর তীরে ডিহরীতে একটা চাকরী পেলেন। ন্যাড়ার বয়স তখন আট। মাত্র দু'বছর সেখানে ছিলেন মতিলাল। ডিহরীর স্মৃতি শরৎচন্দ্র ভোলেন নি। তাঁর গৃহদাহ উপন্যাসে ডিহরীর কথা অক্ষয় হয়ে আছে।

১৮৮৪-তে মতিলাল ডিহরী থেকে ভাগলপুর এলেন। শরৎ দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে ভর্তি হলো। মণি মামা ও শরৎ এক সঙ্গে পড়ে। বাড়িতে তাদের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন অক্ষয় পণ্ডিত। তিনি সাক্ষাৎ যমরাজ। লাঠিতে অক্ষয় পণ্ডিতের অক্ষয় বিশ্বাস। তাঁর 'রাম চিমটি' ছাত্র মহলে বেশ পরিচিত। একবার খেলে চোখে সরষে ফুল দেখতে হয়। এ হেন পণ্ডিত শরৎ মণির গৃহশিক্ষক। একদিকে পণ্ডিতের তর্জন-গর্জন, অন্যদিকে দু'জনের করুণ আর্তনাদ প্রায়ই শোনা যায়। পরীক্ষার সময় কেবল মাষ্টার মশায় পড়াতে আসেন। অন্য সময় বাড়িতে নিজেদের পড়তে হয়। সকালে ওরা রোয়াকে বসে পড়ে, সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে। দাদু কেদারনাথ বারান্দায় খাটিয়ায় বসে থাকেন। কত লোক তাঁর কাছে আসে, গল্প চলে। ছাত্ররা কিন্তু খুব মনোযোগী—তবে মনোযোগটা পড়াশুনাতে নয় গল্প শোনাতে। দাদু খাটিয়া ছেড়ে একটু বাইরে গেলেই শরৎ বলে ওঠে —'ক্যাট্ ইজ্ আউট। লেট মাইস প্লে....।' মামা বাড়িতে এই পড়ার চিত্র শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসে অম্লান হয়ে আছে।

শরতের চেহারা রোগা, প্যাকাটে। কিন্তু ভীষণ বুদ্ধিমান। নতুন নতুন দুষ্টুমি তার মাথায়। চারটের সময় স্কুল ছুটি হয়। কিন্তু ক'দিন যাবৎ চারটে অনেক আগেই বাজছে। অক্ষয় পণ্ডিতের সন্দেহ হল। কারণ ঘড়িতে তিনিই তো দম দেন। তদন্ত শুরু

করলেন। বুঝলেন ছেলেদের কারসাজি। নাটের গুরু শরৎচন্দ্র হঠাৎ যেন খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছে—'আমি তো এক-মনে অঙ্ক কষছিলাম পণ্ডিত মশাই, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি কিছু জানি নে।'

মামার বাড়ির বুড়ো কোকিলটা মোটেই গান গায় না। এমন যে মধুর স্বর কোকিলের তা শোনা যাবে না? ডাক পড়ল দলনেতার। শরৎচন্দ্র বলে এ আর এমন কি সমস্যা! আমার 'ধন্বন্তরি রসায়ন' খাওয়ালে কোকিল একেবারে পঞ্চমতানে গান করবে। তার আদেশ-মত কচি আমপাতার রসের সঙ্গে মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে রসায়ন তৈরী হল। জোর ক'রে বুড়ো কোকিলের গলায় ঢেলে দেওয়া হল। সকলে ভিড় করে আছে। কখন কোকিল গান করবে। একি, কোকিল যে পর পারের গান ধরেছে! অব্যর্থ ওষুধ ব্যর্থ হলো। শরৎচন্দ্র ততক্ষণে চম্পট। 'সংসার-কোষ' বই থেকে সে একটা নতুন বিদ্যা শিখেছে। বেল গাছের শিকড় ধরলে সাপ নিস্তেজ হয়ে যায়। পরীক্ষার জন্য সাপ খুঁজে বেড়ায়। একদিন বিষধর এক সাপের দেখাও মিলল। যেই না শিকড় ধরা অমনি সাপ রেগে বার বার ছোবল দিতে লাগল। কই, সে তো মাথা নীচু করছে না। বেগতিক দেখে মণিমামা সাপটিকে মেরেই ফেলল।

শনিবারের বিকেলবেলা ছেলেদের বড় মজা। বেপরোয়া, নির্ভীক শরৎ মণিমামাকে নিয়ে লুকিয়ে গঙ্গার ধারে যায়। উঁচু পাড় থেকে জলে ঝাঁপ দেয়। দাদু অঘোরনাথ বাড়ি ফিরে তাদের এ বীরত্বের কথা শোনেন। তিনি রেগে আগুন। চুপি চুপি দুই বীর বাড়ি ফিরলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মণিমামা একচোট খড়মপেটা খেল। অবস্থা সুবিধে নয় দেখে শরৎ সরে পড়ল। সারা রবিবার তার কোন পাত্তা নেই। সোমবারে দাদু বাড়ি থেকে চলে গেলেন।

আর তখনই দেখা গেল শরৎ দিব্বি আরামে গোয়ালের চালে বসে পেয়ারা চিবোচ্ছে। সকলে জিজ্ঞেস করে 'কোথায় ছিলি ? 'গোয়াল ঘরে।' 'কি খেতিস ?' 'কেন, ভাত, মাছ, ডাল সবই। দিদিমাই সব জোগান দিতেন।'

মামা বাড়ির উত্তর দিকে একটা পোড়ো বাড়ি, তার পিছনে



মুন্সী বাবুদের গড়ের জঙ্গলে তাদের গোপন আড্ডা (পৃঃ ১০৭)

নিমগাছ, গোলঞ্চ গাছ, দাতরঙা গাছের জঙ্গল। মাঝখানে একটু ফাঁকা। জায়গাটা বেশ নির্জন। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে। পাশেই কুলু কুলু রবে গঙ্গা বয়ে যায়। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর পরিবেশ। এটি শরৎচন্দ্রের 'তপোবন'। এখানে বসে সে বড় বড় কথা ভাবে।

১৮৮৯ সালে মতিলাল আবার দেবানন্দপুরে ফিরে এলেন। শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হয়। গ্রাম থেকে পাঁচজন স্কুলে যায়। ন্যাড়া দলনেতা। স্কুলে যাওয়ার পথে সে মজার মজার গল্প বলে। তাঁর 'দত্তা' উপন্যাসে পাড়াগাঁয়ের এই অখ্যাত কাঁচা রাস্তা স্থান পেয়েছে। ন্যাড়ার দলের দস্যিপনায় সারা গ্রাম তটস্থ। মুন্সী বাবুদের গড়ের জঙ্গলে তাদের গোপন আড্ডা। গর্ত খুঁড়ে মাটির তলায় ঘর বানিয়েছে। চুরি করা আম, কাঁঠাল, জাম, আনারস, কলা সব এখানে জমা হয়। সুবিধে মত সেগুলির সদ্ব্যবহার চলে। বামাল সমেত এই খুদে দস্যুদের ধরার জন্য সবাই সজাগ। কিন্তু দলনেতা আরো চতুর। ধরা অত সহজ নয়। অসীম সাহসী সেই হাতে সব সময় থাকে একটা ছোরা। ভয় কাকে বলে জানে না। অন্ধকার রাত্রি,ভীষণ দুর্যোগ। ভয়ে কুকুর বিড়ালও পথে বার হয় না। নিজের কাজ ঠিকই সমাধা করে ফিরে আসে। শরৎ দুরন্ত, দুষ্টু কিন্তু তার মনটি বড় কোমল। গরীব, দুঃখীদের বন্ধু সে। বড়লোকের বাগান থেকে, পুকুর থেকে চুরি করা ফল, মাছ গোপনে গরিবদের বিলিয়ে দেয়। কারো অসুখ। শরৎ একাই চললো রাত্রে দূর শহরে ওষুধ আনতে। বিরক্ত হলেও গ্রামের লোক তাকে ভালবাসে।

১৮৯২ সালে দাদু কেদারনাথ মারা গেলেন। মতিলাল চোখে অন্ধকার দেখলেন। মা ভুবনমোহিনীর কি করুণ অবস্থা! দারুণ অভাব। পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। ভয়ে মতিলাল বাড়ি ঢোকেন না। ঠাকুরমা ধার দেনা করে কোনরকমে চালান। শরতের পড়া প্রায় বন্ধ। মাঝে মাঝে সে কোথাও উধাও হয়ে যায়। একবার পায়ে হেঁটে সে পুরী চলে যায়।

শরৎচন্দ্রের জন্যে দেবানন্দপুর আজ তীর্থস্থান। সাহিত্যতীর্থ।

কিন্তু একদিন এখানেই কি অসহায় অবস্থার মধ্যে তাঁদের দিন কেটেছে। না আর পারা যায় না। মতিলাল আবার পাড়ি দিলেন ভাগলপুর, শরৎ তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছে। তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ে। কেদারনাথের পূজোর ঘরে সে থাকে! কাঠের বাক্সের বই এর সেল্‌ফ, ছোট্ট একটা টেবিল, পা ভাঙ্গা একটা চেয়ার, দড়ির ছেঁড়া একটা খাটিয়া—এই হল আসবাব পত্র। চারদিকে দৈন্যের চিহ্ন। পড়ার বই জোটে না, প্রদীপের তেল জোটে না। বন্ধুরা মোমবাতি জোগায়, বই দেয়। তার একটা পোষা বেজি ছিল। শোবার সময় ঘরে ছেড়ে রাখত। একদিন সকালে দেখা গেল শরতের গায়ের কাপড় রক্তে লাল। পাশেই একটি বিষাক্ত সাপ মরে পড়ে আছে। বেজিরই এ কাজ। সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বেজি সেদিন শরৎচন্দ্রকে বাঁচিয়েছে। শরৎ তামাকে মন দিল। যেন কিছুই হয়নি। আরে সাপ, সাপ কোথায় না আছে? মা মনসার পূজো দিলেন। সবাই প্রসাদ পেল। শরৎ বললে; যার জন্য এত কাণ্ড সেই বেজিই কিছু পেল না! তাকে প্রসাদ দিতে হবে। মা বেজির জন্য মাছ প্রসাদ দিলেন।

প্রবেশিকার টেষ্ট পরীক্ষায় শরৎ পাশ করেছে। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার ফি কোথায় পাবে? মা ধরে বসলেন ভাই বিপ্রদাসকে। কিছু একটা উপায় করে দিতেই হবে। মামা বিপ্রদাস চড়া সুদে গুলজারিলালের কাছ থেকে টাকা ধার করে দিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে শরৎ তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ভর্তি হল। এ সময়ে তার এক অদ্ভুত বন্ধু জোটে। নাম তার রাজেন্দ্রনাথ ওরফে রাজু। তার বাবা ভাগলপুরের ইঞ্জিনিয়ার। আশ্চর্য ছেলে এই রাজু। চৌকস ছেলে রাজু। গুণ্ডামিতে তার জুড়ি নেই। ঘুড়ি ওড়ানোতে

সেরা সে। আবার হাতের লেখা মুক্তোর মতো। বাঁশী, হারমোনিয়াম বাজনায় দক্ষ। ভাল গাইতে পারে, অভিনয় করতে পারে। অনেক গুণ তার। দুর্জয় সাহস। ভয় বলে কিছু সে জানে না। শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত বন্ধু বটে।

এক দিন নিরীহ এক শিক্ষক অন্ধকার পথে ঘরে ফিরছেন। এক সাহেব টমটম চড়ে পিছন দিক থেকে এসে অকারণে তাঁর পিঠে চাবুক মারে। তিনি রাজুকে রক্তমাখা পিঠ দেখিয়ে গেলেন। রাজু পরদিন সন্ধ্যার সময় দলবল নিয়ে তৈরী হল। হাতে মোটা কাছি! সাহেবের ফিরবার পথে ওৎ পেতে বসে রইল। মোটা কাছিতে বেধে ফিটন গাড়ী উল্টে সাহেব একেবারে চিৎপাত। সঙ্গে সঙ্গে রাজু ঝাঁপিয়ে পড়ে। উত্তম মাধ্যম বেশ খেয়ে ক্ষমা চেয়ে সাহেব সে যাত্রা বাঁচে।

আর এক দিনের কথা। স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী মারা গেছেন, মাঘ মাস; দারুণ শীত। রাজুর দল এগিয়ে এল। মড়া নিয়ে শ্মশানে চলল। পথে জোর বৃষ্টি শুরু হল। রাত্রিবেলা। মড়া ফেলে সবাই পালাল। কেবল রাজুই মড়া নিয়ে বসে রইল। শেষ রাতে বৃষ্টি থামল। সকলে ফিরে দেখে রাজু নেই। আর মড়াটা ফেঁপে ফুলে ঢোল। সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। রাম নাম করতে লাগল। কি আশ্চর্য! মড়ার লেপের তলা থেকে রাজু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। এই-রাজু। শরতের বন্ধু। এই রাজুকে শরৎচন্দ্র চিরকালের মত ধরে রেখেছেন তাঁর ইন্দ্রনাথ চরিত্রে। প্রিয় বন্ধু রাজুর সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে শরৎ। গঙ্গায় রাত্রিতে ডিঙ্গি ক'রে মাছ ধরা, মাছ চুরি করা তাদের সবচেয়ে ভাল লাগে। শরৎচন্দ্রকে একবার সাপে কামড়ায়। রাজু বহুদূর থেকে এক রোজা এনে তাকে চিকিৎসা করায়।

ছোটবেলা থেকেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য চর্চায়, গান-বাজনায়,

অভিনয়ে খুব ঝোঁক। রাজু তার গান বাজনার গুরু। নিরালা বাগানে গানের চর্চা হয়। যাত্রা দলে শরৎ ভাল অভিনয় করে। স্ত্রী ভূমিকায় তার খুব নাম। গানের গলাও তার ভাল। রাজুর সঙ্গে সখের থিয়েটার দল গড়ে। একবার এই দলের অভিনয় হচ্ছে। স্ত্রীর ভূমিকায় একটি যুবক নেমেছে। ভাল অভিনয় করছে। এমন সময় নাটকের ওপর নাটক। ছেলেটির বাবা স্টেজে উঠে তাকে খড়মপেটা করে। অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। পরে রাজুর সঙ্গে আদমপুর ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। এই ক্লাবে 'জনা'র অভিনয় করে শরৎচন্দ্র খুব সুনাম করে।

কলেজে টেষ্ট পরীক্ষা সুরু হয়েছে। বিজ্ঞানে শরৎ বরাবরই ভাল! অর্ধেক সময়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষা শেষ। এবার বন্ধুদের সাহায্য করতে হবে। হোষ্টেল থেকে উত্তর লিখে দারোয়ানের হাত দিয়ে পাঠাতে লাগল। দারোয়ানের বার বার যাতায়াত দেখে গার্ড-এর সন্দেহ হয়। অবশেষে শরৎকে হাতে নাতে ধরে অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে গেলেন। অধ্যক্ষ রেগে তাকে টেষ্টে পাশ করাবেন না বলে দিলেন। অবশ্য শেষে দয়াপরবশ হয়ে তাকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য শরৎচন্দ্রের। মাত্র কুড়ি টাকা ফি জোগাড় করতে না পেরে তার পরীক্ষা দেওয়া হলো না। তার পড়াশোনা এখানেই শেষ।

কলেজে পড়ার সময় তার মায়ের মৃত্যু হয়। মতিলাল চোখে অন্ধকার দেখলেন। ভুবনমোহিনী ছিলেন তাঁর শেষ আশ্রয়। তিনি গাঙ্গুলী বাড়ি ছাড়লেন। অন্যত্র বাসা নিলেন। নিদারুণ অভাবের তাড়নায় দেবানন্দপুরের বাড়ি বিক্রী করলেন। সংসারে নিত্য অভাব। কোন আয় নেই। এ সব ব্যাপারে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। একদিন দেখা গেল শরৎচন্দ্র নিরুদ্দেশ। সন্ন্যাসীর

বেশে ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুরে এলো। প্রথমে শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে মহাদেব সাউ নামে এক জমিদারের বাড়ি আশ্রয় নেয়। এই সময় ১৯০২ সালে মতিলালের মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ফিরে আসে। সংসারের দায় এখন তার। নাবালক ভাই বোনদের নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখল। মেজভাই প্রভাস চন্দ্রকে ভাগলপুরে, ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে জলপাইগুড়িতে দাদু অঘোর নাথের কাছে আর ছোট বোনটিকে পার্বতী ঘোষালের কাছে রেখে এল। নিঃস্ব, দুঃখী সর্বহারা শরৎচন্দ্র রোজগারের আশায় অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। বড় আশা নিয়ে এল কলকাতা।

পরবর্তী জীবনে শরৎচন্দ্রের পরিচয় বাংলা সাহিত্যের অজেয় কথাশিল্পী হিসেবে। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। ছোটবেলায় ভাগলপুরে থাকতে হাতে লেখা পত্রিকা 'ছায়া'র সম্পাদনা করেন। সেই সাহিত্য চর্চায় আরো যারা ছিলেন তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশ গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ধু নলিনীকান্ত ভট্টশালী, তাঁর বিধবা বোন নিরুপমা দেবী।

......দুখু মিঞা......

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। খাঁ খাঁ রোদ্দুর। কোথাও জল নেই। পোড়া মাঠ। রাঙা-মাটির ধুলোয় ভরা পথ। ক্লান্ত গোরু গাড়ী টানতে টানতে কতবার মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ধুলো-ভরা সেই পথে। সেই গ্রামের এক ছেলে—নাম তার হাজী পাহ্‌লোয়ান। গ্রামের জলের কষ্ট দেখে একদিন সে প্রতিজ্ঞা করল—আমি পুকুর কাটবো আমার গ্রামে। আমি কাটবোই। গ্রামে গরীব বুড়ো মানুষ ভাবে ছেলেটি বলে কি? তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? তার আছে কি? টাকা কোথায়? কোথায় তার সম্পদ? না, সম্পদ তার ছিল—তা ছিল তার মনে, তার শরীরে।

দিনের পর দিন যায়। হাজী পাহলোয়ান কঠোর পরিশ্রম করে। তিলে তিলে সংগ্রহ করে অর্থ। একদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের অর্থ নিয়ে সে কাজ শুরু করে। শুরু করে পুকুর কাটা! কাঙালের ধন, রক্তজল করা অর্থ, সারাজীবনের সঞ্চয় কেউ কি এমন করে ব্যয় ক'রতে পারে? পারে। যার হৃদয়ে আছে ভালবাসার ঝরণা ধারা! হাজী পাহ্‌লোয়ানের অন্তরে সদা প্রবাহিত সেই ভালবাসার ঝরণা ধারা! একদিন পুকুর কাটা শেষ হলো। হাজীর মুখে সাফল্যের হাসি। এতদিনে তার মনের সাধ পূরণ হলো।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছোট মসজিদ। সেদিকে তাকিয়ে হাজী সাহেব ভাবেন—এ তো তোমারই দান—এ জল-আকাশ-বাতাস সবই তোমার। তাই এ পুকুরের নাম হবে পীর পুকুর। সেই থেকে পুকুরটির নাম পীর পুকুর। পুকুরের পূব পাড়ে হাজী সাহেবের সমাধি আর পশ্চিম পাড়ে ছোট্ট একটি মসজিদ।

এই মসজিদ ও সমাধির সেবায়েত কাজী ফকির আহ্‌মদ। কাজী সাহেব বড় গরীব। সেবায়েতের কাজ ক'রে কোন রকমে

সংসার চলে তাঁর! গরীব হলেও খুব সৎ তিনি। ধর্মে তাঁর গভীর নিষ্ঠা। আর বুকভরা ভালবাসা। হিন্দু, মুসলমান সকলকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর হৃদয় ছিল উদার। মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবে দেখেছেন—হিন্দু হিসেবে নয়—মুসলমান হিসেবেও নয়। এই গরীব কাজী ফকির আহ্মদের ঘরে এলেন ভবিষ্যতের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। দিনটি ছিল ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে)। মা জাহেদা খাতুন। নজরুলের ঠাকুর্দার নাম কাজী আমিনুল্লাহ্।

নজরুলের পূর্ব-পুরুষদের আদি নিবাস ছিল বিহারের পাটনা জেলার হাজিপুরে। তখন দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম। সেই সময় তাঁরা চলে এলেন বাংলা দেশে। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। বর্তমানে চুরুলিয়া গ্রাম অখ্যাত। কিন্তু একদিন এই গ্রামের নাম ডাক ছিল! ছিল তার সমৃদ্ধি, ছিল-সুখ্যাতি। রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী! অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের বড় কেন্দ্র! আজো দেখা যায় ভাঙা ইঁটের স্তূপ! চুরুলিয়া গড় নামে পরিচিত। অতীতের কত গৌরবময় কাহিনীর নীরব সাক্ষী!

মোগল আমলে চুরুলিয়া গ্রামে ছিল বিচারালয়। মোগল আমলে বিচারকদের বলা হত কাজী। তাঁরাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নজরুল ইস্লামের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মোগল বাদশাহের কাজী। এই কাজী বংশ মোগল আমল থেকে আয়মা সম্পত্তি ভোগ করে আসছেন।

সেই মোগল রাজত্ব আর নেই, সঙ্গে সঙ্গে কাজীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও গেল। চুরুলিয়ার কাজীরা ধীরে ধীরে গরীব হয়ে পড়লেন। ধাপে ধাপে দারিদ্রের শেষ সীমায় পৌঁছলেন। বড় দুঃখে তাঁদের দিন কাটে। এমনি এক দুঃখের দিনে কাজী ফকির আহ্মদের দুঃখের সংসারে জন্ম নিলেন নজরুল। পর পর চার

ছেলের মৃত্যুর পর এই ছেলের জন্ম। এই অপার দুঃখের সমুদ্রে জন্ম ছেলেটির ; তাই বাপ-মা নাম রাখলেন 'দুখু'—দুখু মিঞা। কে জানত এই দুখুর অশান্ত কৈশোর একদিন সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে ? কে জানত তাঁর যৌবন বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে ? কে জানত তখন দেশের নিপীড়িত আত্মা তাঁর উদাত্ত আহ্বান কালবৈশাখী ঝড়ের মত ফুলে উঠবে ? ইতিহাস-পুরুষ বুঝি অলক্ষ্যে একটু হাসলেন।

কাজী ফকির আহ্‌মদ সাহেবের দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র মেয়ে সাজেদেন্নেসা। দ্বিতীয় পক্ষে চার ছেলে খুব ছোটবেলায় মারা যায়। তার পর নজরুলের জন্ম। নজরুলের আরো দুই ভাই ছিল, বড় কাজী সাহেজান, আর ছোট কাজী আলি হোসেন ; আর একমাত্র সহোদর বোন উম্মে কুলসুম।

ফকির সাহেবের বাড়ির পূর্ব দিকে ছিল রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর দক্ষিণে ছিল পীর পুকুর। নজরুলের বাবা ও ঠাকুর্দা সারা জীবন ধরে পীর সাহেবের সমাধি ও মসজিদের সেবা করে কোন রকমে সংসার চালিয়েছেন। বাবা ফকির সাহেব ছিলেন সৎ নিষ্ঠাবান্, সরল, স্নেহশীল। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট 'দুখু' ও ঐ মাজার আর মসজিদের সেবার কাজে মাঝে মাঝে লাগে। তার বাবা সাধারণ মোল্লা বা মৌলভীর মত গোঁড়া ছিলেন না। সকল ধর্মের লোকের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। তাঁর কাছে সকল ধর্মের লোকেরাই আসতো। ধর্মে ধর্মে বা মানুষে মানুষে নেই কোন ভেদ—এই মহান শিক্ষা নজরুল তাঁর বাবার কাছ থেকে পান। আর বাবার কাছ থেকে পান অপূর্ব দেহ কান্তি। বাবা ফকির আহমদের মতই নজরুল ছিলেন দীর্ঘ, ফর্সা ও অপরূপ সুন্দর।

ছোট্ট ফুট ফুটে সুন্দর ছেলেটি, কিন্তু বড় দুরন্ত। আর পাঁচটি

দামাল ছেলের মতই ধুলো-মাটি মেখে ঘুরে বেড়ায়। দস্যি ছেলে হলেও পাড়ায় সকলে তাকে ভালবাসে। আদর করে ডাকে নজর-আলী বলে। ফকির সাহেবের ঘরে নিত্য অভাব, অনটন। তারই মধ্যে বেড়ে ওঠে দুখু। শত অভাবের মধ্যেও দুখুর মুখে হাসিটি লেগে আছে। হাসি দিয়ে সে অভাবের সংসার ভরিয়ে দিতে চায়। আর কী ধারালো বুদ্ধি তার, ধীরে ধীরে তার মধ্যে দেখা গেল ধর্মভাব আর কবিতা লেখার শক্তি। দুটি গুনই বাবার কাছ থেকে পাওয়া। বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান, ধার্মিক। তাছাড়া বাংলা ও ফারসী কবিতার প্রতিও ছিল ভালবাসা। নজরুলের কাকা কাজী বজলে করিমও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও কবিতা লেখেন। এ সব কারণে ছোট বেলা থেকেই নজরুলের মধ্যে কাব্যপ্রীতি দেখা যায়। বলতে গেলে কাকাই নজরুলকে কবিতা লেখায় হাতে খড়ি দেন।

গ্রামের মৌলভী। কাজী ফজলে আহাম্মদ। সকলে তাকে মান্যি-গন্যি করে। কিন্তু দুখুর কোন ভয় নেই। দুখু অবাক হয়ে শোনে মৌলভী সাহেব কী সুন্দর সুরে, ছন্দে রুবাই আর বয়েৎ পড়েন। মৌলভী সাহেবও এই ছোট্ট ছেলেটিকে দেখেন আর ভাবেন —কী তার আগ্রহ! দুখুর আগ্রহে মৌলভী সাহেব তাকে কোরাণ পড়তে শেখালেন। অতি অল্প সময়ে একটি নতুন ভাষা শিখে নিল।

দুঃখীর ঘরে জন্ম দুখু মিঞার। তার মত ছোট ছেলেরা সব স্কুল যায়। দুখু চেয়ে চেয়ে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ভাল করে তাদের খাওয়াই হয় না, তা স্কুলে পড়বে কেমন করে? তাই একটু বেশী বয়সেই গ্রামের মক্তবে দুখুর পড়াশুনা শুনা শুরু। কিন্তু দুখুর পোড়া কপাল।এই সময় তার বাবা ফকির সাহেব মারা গেলেন। দুখু তখন আট বছরের শিশু। ফকির সাহেবের মৃত্যুর পর মা জাহেদা খাতুন অকুল সাগরে ভাসলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে; কে তাদের

খাওয়াবে পরাবে! ছোট্ট দুখুর ওপর এখন গুরু দায়িত্ব! সংসার চালাবার গুরু ভার। বাবার মৃত্যুর পর ছোট্ট দুখু বাবার কাজে বহাল হল—অর্থাৎ মাজার ও মসজিদের সেবার কাজে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মক্তবে পড়াশুনাও চলতে লাগল। ঐ মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করল ১৩১৬ সালে। বয়স মাত্র দশ বছর।

এই অল্প বয়সেই কিছু রোজগারের জন্য মক্তবে শিক্ষকতার কাজ নিল। এ ছাড়া মাজারের খাদেমের (সেবায়েত) কাজ ও মসজিদের এমামতির (ধর্মব্যাখ্যার) কাজও করে। তাছাড়া মোল্লাগিরি করেও সামান্য আয় হত! সাধুসন্তদের সঙ্গে নজরুলের খুব ভাব। হিন্দুর পুরাণ, ধর্মতত্ব তাকে আকর্ষণ করে। খুব ছোট বেলা থেকেই হিন্দুর সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয়। যেখানে ধর্ম কথা সেখানে নজরুল—হোক সে কোরাণ পাঠ, কীর্তন, হিন্দুর কথকতা যাত্রাগান।

গ্রামের সবাই দুখুকে ভালবাসে। কী মিষ্টি গলা তার, ভাল গান গাইতে পারে। তাছাড়া কী সুন্দর হাসি তার। দিলখোলা হাসি। এমন ছেলেকে ভাল না বেসে থাকা যায়! তারা আরো জানল দুখু কবিতা লেখে আবার মুখে মুখে গান বাধতে ওপারে। তারা দুখুকে সমানে উৎসাহ দেয়। তাদের উৎসাহে একটার পর একটা গান-কবিতা লিখে চলে ছোট্ট নজরুল।

মক্তবের শিক্ষকতা এক বছর হয়ে গেল। আর এ একঘেয়েমি নীরস জীবন নজরুলের ভাল লাগে না। এই সময়ে চুরুলিয়ায় অনেক পল্লীকবি ছিল। সে সময় ঐ সব অঞ্চলে 'লেটো নাচ' নামে এক ধরণের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। 'নাটক' কথা থেকেই 'লেটো' কথাটা এসেছে। কবি গান ও যাত্রাগানেয় একটা মিশ্রিত রূপ হল 'লেটো গান'। পল্লী কবিরা কবিতায় গান রচনা ক'রে নাচ ও গানের সঙ্গে গাইতেন—এটাই লেটো নাচ। সে সময় 'লেটো নাচ' খুব

জনপ্রিয় ছিল। নজরুল শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে মিশলো এই লেটোনাচের দলে। দেখতে দেখতে নজরুল 'লেটো নাচের' মধ্যমণি হয়ে উঠলো।

সেই সময় 'লেটো নাচের' শ্রেষ্ঠ কবিকে বলা হত 'গোদা কবি', তখন চুরুলিয়া অঞ্চলের 'গোদাকবি' ছিলেন চাকরা গোদা। তিনি নজরুলের গান ও কবিতা লেখার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হন। তিনি আদর করে নজরুলকে ডাকতেন 'ব্যাঙাচি' বলে। নজরুল লেটের দলের জন্য গান আর নাটক লিখে দিতেন। তাতে আয়ও হতো ভাল। এই সময়ে নজরুল নিমসা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিন গ্রামের তিনটি 'লেটো নাচের' দলে নাটক লেখার ভার পান। এ সময় তার বয়স বার কি তের বছর। তিনি কবি বলে পরিচিত হলেন। এই সময় তিনি নিমসা দলের ওস্তাদের পদও পান।

এর মধ্যে প্রায় চার বছর কেটে গেছে। নজরুলের বিবাগী মন আর লেটোর দলে থাকতে চাইল না। গানের দল আর যেন ভাল লাগে না। হঠাৎ দল ছেড়ে দিলেন। আবার পড়াশুনা করলে কেমন হয়। একদিন গ্রাম ছেড়ে উধাও। দেখা গেল নজরুল বর্ধমান জেলার মাথরুণ হাইস্কুলে পড়ছেন। প্রখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রধান শিক্ষক। নজরুল ঐ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে (১৯১১) পড়ছেন তখন। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে উঠেই আবার পলাতক! এক জায়গায় বেশিদিন থাকবার ছেলে নন নজরুল। স্কুলের ছক-বাঁধা জীবন তাঁর ভাল লাগে না।

এবার যোগ দিলেন সখের কবিগানের দলে। গান লেখেন, পালা লেখেন—তাতে সুর দেন। আসরে আবার ঢোলক বাজিয়ে গানও করেন। এক শীতের রাতে কবিগানের আসর বসেছে। শ্রোতাদের মধ্যে অণ্ডালের বাঙালী গার্ডসাহেব। গার্ডসাহেব নজরুলের গান শুনে তন্ময় হয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে নিয়ে এলেন

প্রসাদপুরে। সেখানে বাংলোতে বাবুর্চীর কাজ দিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নজরুল গার্ডসাহেবের চাকরি ছেড়ে দিলেন।



এবার যোগ দিলেন সখের কবিগানের দলে। (পৃঃ ১১৭)

নজরুল চলে এলেন আসানসোল শহরে। কিন্তু কোথায় পাবেন আশ্রয় ? কেই বা দেবে তাঁকে চাকরি, কিন্তু কিছু একটা তাঁকে করতেই হবে, নইলে পেট চলবে কি করে। বহু কষ্টে একটি চাকরি মিলল একটি রুটির দোকানে। দোকানীর নাম আবদুল ওয়াহেদ ! এখানে হাড়-ভাঙা খাটুনি। মাইনে কম, মাত্র পাঁচ টাকা। সেই কোন্

ভোরে উঠে ময়দা মাখতে হয়। সমস্ত দিন ধরে রুটি বানাতে হয়, বিক্রি করতে হয়। সারাদিন খাটুনির পর রাতে যখন ছুটি মিলত তখন দু-চোখ জুড়ে ঘুমের ঢল নামত, কিন্তু নজরুল শুতেন না তখন। বই পড়ে কবিতা লিখে কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর গানে আর যন্ত্র সঙ্গীতে একদিন আকৃষ্ট হলেন আসানসোলের দারোগা কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ। তিনি এই সাধারণ ছেলেটির মধ্যে দেখলেন প্রতিভার আগুন। অবহেলায় কি নষ্ট হয়ে যাবে এরকম একটা প্রতিভা! না তা হতে পারে না। রফিজউদ্দীন সাহেবের নজরে পড়ে গেলেন নজরুল। দারোগা সাহেবের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায় কাজীর-সিমলা গ্রামে। তিনি নজরুলকে নিজের গ্রামে নিয়ে গেলেন, ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে ভর্তি করে দিলেন দরিরামপুর হাই স্কুলে। অবশ্যই ফ্রি স্টুডেন্ট হিসাবে। ক্লাশ সেভেনে।

কিন্তু ভাল ছেলে হয়ে মন দিয়ে পড়া শুনা করা নজরুলের ধাতে নেই। স্কুলে যাওয়ার নাম করে বইখাতা বগলে নিয়ে রোজ বার হন, সময় মত ফিরেও আসেন। কাজীর সিমলা গ্রাম থেকে দারিরামপুর স্কুল প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। নজরুল রোজ হেঁটেই যেতেন! স্কুলে যাওয়ার পথে পড়ে মস্ত বটগাছ। গাছের কোটরে বই পত্র রেখে প্রায় দিন নজরুল চাষী ছেলেদের সঙ্গে গল্প জমান। তাদের সঙ্গে তামাক খেয়ে গান গেয়ে সারাটা দিন কেটে যায়। খোলা মাঠ, ঝির ঝিরে বাতাস, গানের সুর কী আনন্দ! আর কি চাই। মাথায় থাক পড়াশুনা। দিনের শেষে সুবোধ ছেলেটির মত নজরুল বই খাতা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এমনি করে বেশ আনন্দে দিন যায়। সর্বনাশ বার্ষিক পরীক্ষা যে এসে গেছে! সব যে এবার ধরা পড়ে যাবে! যাই হোক নিয়মিত তো পরীক্ষায় বসলেন; একমাত্র বাংলা পরীক্ষার দিন কবিতার সব উত্তর লিখলেন।

পরীক্ষার ফল বার হল। একমাত্র বাংলা ছাড়া সব বিষয়ে গোল্লা। নজরুল তো জানেন খাতায় কী লিখে এসেছেন।

না আর পড়াশুনায় মন বসল না নজরুলের। স্কুলের একঘেয়ে জীবন তাঁর জন্যে নয়। চাই বৈচিত্র্য। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই লেটোর দলই ভাল। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে দল নিয়ে গান গাওয়া যাবে। সেই ভাল। অতএব ময়মনসিংহ এবার বিদায়। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়েই ময়মনসিংহ ত্যাগ করলেন।

ফিরে এসে লেটোর দলে যোগ দিলেন। কিছু দিন রইলেন। কিন্তু এ জীবন তাঁর ভাল লাগল না। আবার পড়াশুনা করবেন স্থির করলেন। ছেড়ে দিলেন লেটোর দল। ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে ভর্ত্তি হলেন। ছাত্রাবাসেও বিনা খরচে থাকার ব্যবস্থা হল। রায়সাহেব এম, চ্যাটার্জীর ফুলের বাগান। তার পাশে মাটির দেয়ালের একটি ছোট ঘর। এটিই ছাত্রাবাস, নাম মোহা-মেডান বোর্ডিং'। এখানেই আর চারজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে রইলেন নজরুল। নজরুল রাজবাড়ি থেকে মাসে মাসে সাত টাকা করে বৃত্তি পেতেন। এই টাকায় চা জল খাবার জামাকাপড় ও অন্যান্য টুকি-টাকি খরচ চলত। এই টাকা থেকে আবার কিছু জমিয়ে ছোট ভাই আলী হোসেনের পড়ার খরচ পাঠান। এই স্কুলে তিনি দীর্ঘ তিন তিনটি বছর টিকে ছিলেন।

এই স্কুলে পড়ার সময় পরিচয় হলো পরবর্তীকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি পাশে রাণীগঞ্জ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়েন। দু'জনের বন্ধুত্ব দেখতে দেখতে গভীর হয়ে উঠল। এ সম্পর্কে শৈলজানন্দ বলেছেন,—'পাশাপাশি দুই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ছি আমরা। আমি রাণীগঞ্জে, নজরুল শিয়াড়সোল রাজার ইস্কুলে। থার্ড ক্লাসে এসে মিশলাম দু'জনে। আমি

হিন্দু ও মুসলমান—আশ্চর্য হচ্ছে আমি লিখি কবিতা—ও লেখে গল্প। তবু মিললাম দুজনে। সেই টানে মিললাম, যে টানে ধর্মাধর্ম নেই, বর্ণাবর্ণ নেই—সৃষ্টির টান—সাহিত্যের টানে। দুইজনে রোজ একসঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোনদিন বা ইস্কুল পালাই।'

এ রকম ভাবে দুই বন্ধুতে পড়া-শুনার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য চর্চা চলে। জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ডুবে থাকেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে প্রিয়। কেউ রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করলে বা দুর্নাম দিলে তিনি মোটেই সহ্য করতেন না। একবার তাঁর এক বন্ধু খেলার মাঠে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করেন। আর যায় কোথায়? বাঁশের গোলপোস্ট তুলে নিয়ে সজোরে আঘাত বন্ধুর মাথায়।

তিন বছর শিয়াড়শোল স্কুলে বেশ ভাল ভাবেই কাটল। এই স্কুলে পড়ার সময় কলকাতার খিদিরপুর থেকে ফারসী ভাষার শিক্ষক হয়ে এলেন হাফিজ নুরুন্নবী। নজরুলের সাহিত্য প্রতিভা দেখে নুরুন্নবী সাহেব মুগ্ধ। তিনি নজরুলকে ফারসী ভাষায় ও সাহিত্যে অনুরাগী করে তোলেন।

শিয়াড়শোল স্কুল থেকে নজরুল প্রি-টেষ্ট পরীক্ষা দিলেন। ওদিকে ইউরোপে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে দ্রিমি দ্রিমি। দেশময় যুদ্ধের সাজো সাজো রব। নজরুল ও তাঁর বন্ধু শৈলজার আর পড়ায় মন বসে না। তাছাড়া ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধ বিদ্যাটা ভাল করে শেখা দরকার। কারণ যুদ্ধ করেই তো বিদেশী ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে। যুক্তিটা শৈলজানন্দের বেশ মনে খাটল। দুজনেই ক্ষেপে উঠলেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। প্রি-টেষ্ট পরীক্ষা দিয়েই দুই বন্ধু চুপি চুপি পালিয়ে গেলেন আসানসোল। সেখান থেকে এস, ডি, ও-র চিঠি নিয়ে সটান

কলকাতা। নজরুলের বয়স তখন সতের। ডাক্তারী পরীক্ষায় শৈলজানন্দ বাদ পড়লেন। মনোনীত হলেন নজরুল। হতাশ হয়ে শৈলজানন্দ বন্ধুকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন।

নজরুল ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দিলেন ১৯১৭ সালে। এই পল্টনের সাধারণ সৈনিকরূপে প্রথমে লাহোর হয়ে যান নৌসেরাতে। সেখানে তিনমাস ট্রেনিং নিলেন। ট্রেনিংএর পরে করাচী সেনানিবাসে চলে গেলেন। শুরু হল নজরুলের জীবনের এক নতুন অধ্যায়। চুরুলিয়ার সেই দুখু মিঞা কাঁধে তুলে নিলেন রাইফেল। চারদিক মিলিটারী নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা। কোথায় গেল সেই নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুঘু-ডাকা চুরুলিয়া গ্রাম!

নজরুলের সৈনিক জীবন ১৯১৭ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। প্রথমে তিনি ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের সাধারণ সৈনিক ছিলেন। নিজের দক্ষতায় পরে হাবিলদারের পদ লাভ করেন। অনেকের ধারণা নজরুল সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্র মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। নজরুল করাচীর বাইরে কোথাও যান নি।

নজরুল ছিলেন আবাল্য কবি। তাই করাচীর কঠোর সৈনিক জীবনের মধ্যে থেকেও সাহিত্য চর্চা করতেন। এই সময় ফারসী কাব্যের সঙ্গে তাঁর নতুন করে পরিচয় হল। ঐ সময়ে বাঙালী পল্টনে ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত একজন মৌলবী সাহেব ছিলেন। মৌলবীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল নজরুলের। তিনি মৌলবী সাহেবের কাছে ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। আর একে একে ফারসী কবিদের সব সেরা কাব্য পড়ে ফেললেন। হাফিজ পড়ে এতই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তিনি হাফিজের গজল অনুবাদ শুরু করে দিলেন।

করাচীর সৈনিক শিবির। বারুদের ধোঁয়া, যুদ্ধের উন্মাদনা। তবু

কবি-মন মরে না। এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে কলম। লিখলেন কত কবিতা, গল্প, গান। নজরুলের 'রিক্তের বেদন' গল্প গ্রন্থের সব গল্পই আরবসাগরের বিজন বেলায় বসে লেখা। করাচী থেকে নজরুল কত গান গল্প কবিতা লিখে পাঠাতেন কলকাতার বিভিন্ন কাগজে। কিন্তু নতুন লেখকের ভাগ্যে যা ঘটে হাবিলদার কবি নজরুলের ভাগ্যেও তাই হল। অনেক লেখাই সম্পাদকের বাজে কাগজের ঝুড়িতে গিয়ে পড়ত। অবশ্য কিছু কিছু লেখা ঐ সময়ে বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়। তাঁর 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি ছাপা হয় সওগাত মাসিক পত্রিকায়। এই পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন এম. নাসির উদ্দীন। এই গল্পটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প। ঐ সওগাত পত্রিকাতেই বিভিন্ন সংখ্যায় 'কবিতা সমাধি' নামে ব্যঙ্গ কবিতা, গল্প 'স্বামীহারা' আর প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' বার হয়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা মুক্তি, এবং দুটি গল্প হেনা আর 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কম্‌রেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তিনি তো নজরুলের লেখা দেখে অবাক। যুদ্ধ প্রান্তর থেকে কেউ যে কবিতা লিখতে পারে এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না! মুগ্ধ মুজফ্‌ফর সাহেব করাচীতে নজরুলকে চিঠি দিলেন। সেই থেকে দুজনের মধ্যে গভীর ভালবাসা।

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' তখন বিখ্যাত পত্রিকা। নজরুল একটি অনুবাদ কবিতা পাঠালেন সবুজ পত্রে কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর পছন্দ হলো না। তখন ঐ পত্রিকায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কাজ করতেন। তিনিই কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কে পাঠান। চারুচন্দ্র কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশ করেন।

এমনি করে দুটি বছর কেটে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ। এবার বিদায়ের পালা। ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টও ভেঙে গেল। নজরুল ফিরে এলেন কলকাতা। এসে উঠলেন মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। সেখান থেকে গেলেন চুরুলিয়াতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এবার তো একটা চাকরী দরকার। এখানে ওখানে দরখাস্ত করেন। এমনি করে বর্ধমানের জেলা শাসকের অফিসে 'সাব্-রেজিস্টার' পদের জন্য দরখাস্ত করেন। ইন্টারভিউ লেটার এলো। কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ বন্ধুদের পরামর্শে তিনি সরকারী চাকরি নিলেন না। একে তো ইংরেজ সরকারের গোলামী তার ওপর তাঁর সাহিত্য-বাধা পড়বে। না—অসম্ভব ইংরেজের গোলামী আর নয়।

শুরু হল নজরুলের নতুন জীবন। সাহিত্য জীবন। তিনি কলিকাতা চলে এলেন॥ কলকাতার সাহিত্যিক মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ট হলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা বার হতে থাকে। বিশেষ করে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় একে একে তাঁর বহু কাব্য কবিতা বার হতে থাকে। এই মোসলেম ভারতে ১৩২৮এর কার্তিক সংখ্যা যেন একটা ভূমিকম্প নিয়ে এল। বার হলো 'বিদ্রোহী, আর 'কামালপাশা' কবিতা দুটি; পড়ে সমস্ত দেশ যেন থর থর কেঁপে উঠল। বাঙালীর সুখের নিদ্রা গেল টুটে। সমস্ত দেশ যেন নাড়া খেয়ে উঠল। বাঙালী যুবকের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠল।

—'আমি বিদ্রোহী....'

—হাবিলদার কবির নব জন্ম হল বিদ্রোহী কবিরূপে। শুরু হল জয়যাত্রা বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের।

೬೨